অলিউল্লাহ নোমান

কাঁটাতারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ

কাঁটাতারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ

অলিউল্লাহ নোমান

মাতৃভাষা প্রকাশ

www.pathagar.com

প্রকাশক ▼ এম. আনসার উদ্দীন
১১, পি. কে. রায় রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব ▼ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকাল ▼ একুশে বইমেলা ২০১০
প্রচ্ছদ ▼ ডিজিটাল সাজঘর
বর্ণবিন্যাস ▼ একুশে কম্পিউটার
মুদ্রণ ▼ সাদাত প্রিন্টার্স
মূল্য ▼ ১২০ টাকা

পরিবেশক ▼ হাসি প্রকাশনী,
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

KATA TARE ABARUDDHA BANGLADESH, Oliullah Noman. Email: oliullahnoman@yahoo.com. Published by Matribhasha Prokash. 11, P.K. Roy Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Phone : 01716315884

US $ 5.00

ISBN 984-70270-0000-9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্বাধীনতার পর থেকে সীমান্তে ভূখণ্ডের
সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যারা প্রাণ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- পাহারায় নিরস্ত্র বিডিআর–১৭
- পায়ে হেঁটে টহল দেয় বিডিআর –২০
- চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য হিলি সীমান্ত–২৩
- তিনস্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভারতের
  কাঁটাতারের বেড়ায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশ –২৬
- ছিটের মানুষ নিজভূমে পরবাসী-২৯
- এখনও বিচ্ছিন্ন বড়াইবাড়ী সীমান্ত ক্যাম্প–৩৩
- ভারতের কারসাজি নদীতে বিলীন হচ্ছে দহগ্রাম তেঁতুলিয়া –৩৬
- চাঁপাই, নওগাঁর দুর্গম এলাকার বিওপিতে যাওয়ার রাস্তা নেই–৩৮
- টর্চ হাতে সীমান্ত পাহারায় বিডিআর–৪১
- জরুরি সরকার নানা কৌশলে বিডিআরকে দুর্বল করেছে–৪৪
- বিএসএফের সহায়তায় আসছে মাদকসহ নানা পণ্য–৪৬
- গুলি চালানোর অনুমতি নেই বিডিআরের–৪৮
- নমনীয় বিডিআর : ঔদ্ধত্য বেড়েছে বিএসএফের–৫০
- পাদুয়া ক্যাম্প এখনও বিএসএফের দখলে–৫২
- ইমিগ্রেশন অফিসে সোলার সেল স্থাপনেও বিএসএফের বাধা–৫৪
- বাল্লায় জমি দখলসহ নানা বাড়াবাড়ি বিএসএফের–৫৬
- সীমান্তজুড়ে ভারতীয় ফেনসিডিলের আগ্রাসন–৫৮
- কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে বিএসএফ–৬০
- সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল আতিকুর রহমান–৬১
- সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান–৬৪
- রামগড় লুকাল ব্যাটালিয়ান থেকে বিডিআর–৬৭
- চুক্তির আবর্তে 'তিনবিঘা কডিডোর'
  এবং দহগ্রাম ছিটমহলবাসীর পাওয়া না পাওয়ার কিছু কথা–৭৪

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশ ভারতের সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত। ৩ দিকেই রয়েছে ভারত। দক্ষিণ পূর্ব কোণের কিছু অংশে মিয়ানমার সীমান্ত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস্) ও ভারতের বিএসএফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) ও মিয়ানমানের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী নিজ নিজ দেশের সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত। নিজ নিজ সীমান্তের ভূখণ্ডে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও চোরা চালান দমন হচ্ছে তাদের প্রধান কাজ। সীমান্তে ভূখণ্ডের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারতীয় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে বিডিআর-এর যুদ্ধ বেঁধেছে একাধিকবার। বিশেষ করে ২০০১ সালে কুড়িগ্রামের রৌমারির যুদ্ধ হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী সবচেয়ে বড় লড়াই। বড়াইবাড়ি এলাকার তরুণদের মতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক কাহিনী শুনলেও চোখে দেখার সুযোগ হয়নি। বড়াইবাড়িতে বিএসএফ-এর সঙ্গে লড়াইটাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেই মনে হয়েছে এলাকার তরুণদের কাছে।

বিডিআর-বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘটিত ছোট-বড় সব যুদ্ধেই বিজয়ী হয়েছে বিডিআর। সম্মুখ যুদ্ধে কখনো বিডিআরকে পরাজিত করতে পারেনি বিএসএফ। যদিও বিডিআর-এর তুলনায় বিএসএফ-এর শক্তি কয়েক গুণ বেশি। অস্ত্র, সদস্য, যানবাহন সব দিক থেকে এগিয়ে থেকেও এসব নিয়ে পারছে না বিডিআর-এর সঙ্গে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সীমান্তে নতুন শত্রু হিসাবে আবির্ভূত হয় বিএসএফ। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করতে এসে ভারত সিলেটের একটি বিশাল এলাকা ছেড়ে যায়নি। আজো সেই এলাকা ভারতের দখলে। তারা সিলেটের তামাবিল সীমান্তের কাছে পদুয়ায় একটি ক্যাম্প ও পাশবর্তি এলাকা স্বাধীনতার পর থেকে দখল করে রেখেছে। দীর্ঘ ৩৬ বছরেও তারা এই ভুমি ছেড়ে যায়নি। এনিয়ে সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে মনস্তাত্বিক লড়াই শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকে।

জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে পাশবর্তি রাষ্ট্র হচ্ছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ন্যাচারাল শত্রু। পাশবর্তী রাষ্ট্রের জন্যই সীমান্ত পাহারায় আয়োজন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে। এর ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশেও। আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জন্য ন্যাচারাল শত্রু হচ্ছে বিএসএফ। আবার প্রতিবেশী হিসাবে ভারত আমাদের বন্ধু। প্রতিমাসেই সীমান্তে গুলি করে মানুষ মারছে তারা।

www.pathagar.com

সীমান্তে গুলি করে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করছে। ২০০১ সাল থেকে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৮৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত হয়েছে। আহত এবং পঙ্গু হয়েছে আরো অনেকে।

বিডিআর-এর দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ২১৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই বাহিনীর রয়েছে অনেক গৌরবের ইতিহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এই বাহিনী। তখন এই বাহিনীর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর)। অস্ত্র চালনায় পারদর্শি এই বাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের। নিজেরাও অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। দুই জন বীর শ্রেষ্ঠ হলেন বিডিআর সদস্য। দেশ স্বাধীন হলে এই বাহিনীর নাম পরিবর্তন করা হয়। ইপিআর থেকে নামকরণ হয় বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস্)। তবে কাজ একটাই, সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং চোরা চালান প্রতিরোধ করা।

স্বাধীনতার পর সীমান্তে প্রতিদ্বন্দ্বী বিএসএফ-এর নানারকম উন্নতি হলেও বিডিআর-এর তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ-এর অনেক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হয় গত ৩৬ বছরে। কাঁটাতারের বেড়ার পাশাপাশি বিএসএফ-এর যাতায়াত সুবিধার জন্য তৈরি করা হয় পাকা রিং রোড। উন্নত অস্ত্রের পাশাপাশি দেয়া হয় উন্নত যানবাহন। বিপরীতে একই কাজে নিয়োজিত বিডিআর-এর তেমন কোন সুবিধাই বাড়েনি। বিএসএফ-এর তুলনায় বিডিআর-এর সুযোগ সুবিধা একেবারেই নগণ্য। যাদের মোকাবিলায় সবসময় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে হচ্ছে তারা সুযোগ সুবিধায় অনেক এগিয়ে। এরই মাঝে জেনারেল মইন ইউ আহমদের নিয়ন্ত্রিত জরুরি অবস্থার অসাংবিধানিক সরকারের সময় বিডিআরকে সীমান্ত পাহারা থেকে সরিয়ে এনে দোকানদার বানানো হয়। মুদির দোকানী হিসাবে কাজে লাগানো হয় বিডিআরকে। ডাল-ভাত কর্মসূচির নামে বিডিআর দেশব্যাপি মুদির দোকানদারী শুরু করে। মুদির দোকানের লভ্যাংশ বোনাস হিসাবে দেয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল তাদেরকে। কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি। কোন লভ্যাংশ তারা পায়নি। এসব নিয়ে বিডিআর-এর সাধারণ সদস্যদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ কাজে লাগানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় দেশ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী শক্তি। এক ঢিলে দুই পাখি মারে তারা। দেশের মেধাবী ও চৌকস সেনাঅফিসারদের যেমন একসঙ্গে শেষ করে দেয়া হয়, তেমনি বিডিআরকেও ধ্বংস করার সুযোগ নেয়। এর জন্য বেঁছে নেয় বার্ষিক বিডিআর সপ্তাহকে। ২০০৯ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারী বিডিআর সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটায় ষড়যন্ত্রকারীরা। এই বিদ্রোহ চলে দুই দিনব্যাপী। পিলখানা দুই দিন ও দুই রাত

www.pathagar.com

বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। নিহত হন আমাদের সেনাবাহিনীর ৫৭ জন মেধাবী অফিসার। তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। কারো কারো লাশ স্যুয়ারেজের ড্রেনে ভাসিয়ে দেয় হত্যাকারীরা। এ রকম নৃশংসতা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর বর্বরতাকেও হার মানায়। পিলখানায় আবাসিক এলাকায় অবস্থানকারী সেনা অফিসারদের পরিবার পরিজনরাও নির্যাতনের আক্রোশ থেকে রেহাই পায়নি। নিজ স্ত্রী ও বাসায় আগত বন্ধুর স্ত্রীসহ নিহত হন বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমদ। এই হত্যাকাণ্ডের বর্বরতা টিভির পর্দায় দেখে সারা দেশের মানুষ বিস্মিত হয়। কেন এই বর্বরতা, কেন মেধাবী চৌকস সেনা অফিসারদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হলো? কারা এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে বিডিআরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এ প্রশ্ন জাগে সাধারণ মানুষের মনে। এই সব রহস্য বের করতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তবে এই তদন্ত প্রতিবেদন আজো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। দেশবাসী জানতে পারেনি সেনাবাহিনীর তদন্তে ঘটনার পেছনের কারণ হিসাবে কী পাওয়া গেছে। হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট এখনো জমা দেয়া হয়নি আদালতে। এদিকে এই জঘন্য বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর বিডিআর অনেকটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। লড়াকু মনোবল হারিয়ে ফেলে তারা। নৈতিক মনোবল হারায় পুরো বাহিনী। অনেকেই গ্রেফতার হন। অনেকে আবার পালিয়ে যায়। বাংলাদেশের সীমান্ত তখন একেবারেই নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন। বিডিআর-এর সকল অস্ত্র জব্দ করে নেয়া হয় পুলিশের কাস্টডিতে। নিরস্ত্র করা হয় পুরো বাহিনীকে। স্বাধীনতার পর সীমান্ত কখনো এরকম নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েনি। এমনকি ঘটনার দিন ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী পুরো সীমান্ত অরক্ষিত ছিল। এই অবস্থায় সীমান্ত পরিস্থিতি দেখতে আমার নিজের মধ্যেও মনে মনে একিট কৌতুহল ছিল। সীমান্ত পরিস্থিতি কেমন, অস্ত্র বিহীন কিভাবে বিডিআর পাহারা দিচ্ছে সেটা দেখার খুবই ইচ্ছা ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ করেই একদিন আমার চীপ রিপোর্টার ও ডেপুটি অ্যাডিটর সৈয়দ আবদাল ভাই জানালেন ঢাকার বাইরে অ্যাসাইনমেন্টে যেতে হবে। কি অ্যাসাইনমেন্ট জানতে চাইলে তিনি বললেন সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। আরো জানালেন, পিলখানা হত্যাযজ্ঞের পর সীমান্ত পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে আমার দেশ পত্রিকার পরম শ্রদ্ধেয় সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান আমাকে অ্যাসাইন দিতে বলেছেন। মনে মনে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে বললাম এটাতো আমার নিজেরও প্রবল ইচ্ছা। সার্বিক পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে আনতে হবে। এই অ্যাসাইনমেন্টকে আমি নিজেও কেরিয়ারের জন্য বড় সুযোগ মনে করি। অ্যাসাইনমেন্টটি আমাকে দেয়া না হলে হয়তো:

www.pathagar.com

দেশের সীমান্ত এলাকা ঘুরার এ রকম একটি বিরল সুযোগ আমি পেতাম না। সীমান্ত পর্যবেক্ষণ বা পরিদর্শনে যাওয়ার আগে সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও সাংবাদিক আবু রুশদ ভাইয়ের পরামর্শ নেই। কোন দিক থেকে সীমান্ত পর্যবেক্ষণ শুরু করলে ভালো হবে, সীমান্তের খোজ খবর নিতে হলে কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এসব পরামর্শ দেন আবু রুশদ ভাই। এর জন্য পর পর দুই দিন বনানীতে তাঁর ডিফেন্স জার্নাল কার্যালয়ে যেতে হয়। তৈরি করা হয় কর্ম পরিকল্পনা। সিদ্ধান্ত হয় দিনাজপুরের হিলি স্থল বন্দর সীমান্ত থেকে শুরু হবে পর্যবেক্ষণ। সেই লক্ষ্যে ঢাকা থেকে নীল সাগর ট্রেনের টিকেট সংগ্রহ করা হয়। হিলিতে নীল সাগর ট্রেন থামে না। এজন্য পার্বতীপুর গিয়ে নামতে হলো। পার্বতীপুরে কোন আাবসিক হোটেল নেই। রাত কাটাতে হয়েছে উপজেলা ডাকবাংলায়। পার্বতিপুর প্রতিনিধি রিপন আগে থেকেই সব প্রস্তুতি রেখেছিলেন। পরেরদিন সকালে আবার ট্রেনে বিরামপুর। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন আামর দেশ বিরামপুর প্রতিনিধি মোর্শেদ মানিক। তাঁর মটর সাইকেলে করে বিরামপুরে একটি অস্থায়ী বিডিআর ক্যাম্প দিয়ে শুরু হয় খোঁজখবর নেয়ার কাজ। বিরামপুর থেকে মটর সাইকেলে হিলির উদ্দেশ্যে রওয়ানা। এক মটর সাইকেলে আমরা ৩ জন। হিলি থেকে আরেকটি মটর সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসেন আমার দেশ পত্রিকার হাকিমপুর প্রতিনিধি দেলোয়ার।

তবে বিরামপুর থেকে হিলি যাওয়ার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি। কোথায়ও কোন ঘরবাড়ি নেই। কোন সুযোগ নেই বৃষ্টিতে আশ্রয় নেয়ার। বৃষ্টিতে ভিজে মটর সাইকেল চলছে হিলির পথে। সঙ্গে থাকা ডিজিটাল ক্যামেরা ও মোবাইল বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য ঢুকানো হয় ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে। প্রায় ৪০ মিনিট মুষলধারে বৃষ্টি অতিক্রম করে মটর সাইকেল চলার পর পৌছাই হিলিতে। সেখানে গিয়ে ভেজা জামা কাপড় শুকাতে দিন চলে যায়। বৃষ্টিও থামে বিকালে।

বৃষ্টি থামার পরই বের হয়ে পড়ি সীমান্ত এলাকায়। প্রথমেই হিলি স্থল বন্দরে আগে কখনো সীমান্তের এতো কাছাকাছি যাওয়া হয়নি আমার। সেখানে হিলি চেকপোস্টের (সিপি) বিডিআর ক্যাম্প। নানা কথা হয় কাম্প কমান্ডারসহ পদস্থ কয়েকজন বিডিআর সদস্যের সঙ্গে। জানা যায় তাদের সুখ-দুঃখ। সীমান্তে কাজ করার অনুভূতি, আনন্দ- বেদনার খোশ গল্পের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসে অনেক তথ্য। তবে কথা বলার সময় তারা খুবই সতর্ক ছিল। পিলখানা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই বলা হয় দয়া করে এই প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। কারণ হিসাবে বলা হয় ২৫-২৬ বলতে বিডিআর-এর সবাই আতঙ্কে থাকে। কে কখন এই ঘটনার সূত্র ধরে গ্রেফতার হবে সেই আতঙ্ক তখনো কাটেনি। এছাড়া পিলখানার ঘটনাকে মর্মান্তিক হিসাবে উল্লেখ

www.pathagar.com

করে তারা বলেন, বিডিআর-এর নিজস্ব চিন্তা চেতনা থেকে এরকম কিছু করতে পারে না। যেটা ঘটেছে তাও অস্বীকার করারও কোন উপায় নেই। তাদেরও ধারণা বিডিআর-এর যারা শত্রু তারাই এ নেপথ্যে কাজ করেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা কথা হয় হিলি চেকপোস্টে।

সেখান থেকে বের হয়ে আরো একটি বিডিআর ক্যাম্পে। ওই ক্যাম্পটিতে পৌঁছাতে অন্ধকার নেমে আসে। সেখানে ক্যাম্প কমান্ডার না তাকায় উপস্থিত কয়েকজন জওয়ানের সঙ্গে কথা হয়।

হিলিতে রাত্রি যাপনের পর সকালে আবার যাত্রা শুরু। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে। কিন্তু ক্যাম্পগুলোর অবস্থান এতোই দুর্গম এলাকায় যে কোন কোনটিতে মটর সাইকেলেও যায় না। পায়ে হেটে পৌঁছাতে হয় অনেক ক্যাম্পে। এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে যাওয়ার পথে ভাবনায় আসে বিডিআর কিভাবে এই কাঁদামাটির রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। দিনরাত্রি পায়ে হেঁটে নিয়মিত সীমান্ত টহল দেয়।

দুই দিন হিলিতে কাজ করার পর বিরামপুরে এসে আবার ট্রেনে সৈয়দপুরে। ততোক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর সৈয়দপুর থেকে বাসে পঞ্চগড়ে। সেখানে পৌঁছাতে রাত ১০টার বেশি বাজে। আগে থেকেই আমার দেশ পত্রিকার পঞ্চগড় প্রতিনিধি রায়হানকে জানানো ছিল। তিনি হোটেলে একটি সিঙ্গেল রুম বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। রাত যাপনের পর সকাল ৭টায় আবার রওয়ানা তেতুলিয়া সীমান্তের পথে। সঙ্গে পঞ্চগড় প্রতিনিধি রায়হান। পঞ্চগড় থেকে তেতুলিয়া পৌঁছে সঙ্গে নেয়া হয় তেতুলিয়া প্রতিনিধি এম এ বাসেতকে। পঞ্চগড় থেকে তেতুলিয়া হয়ে বাংলাবান্দা জিরো পয়েন্টে পৌঁছতে কয়েকটি বিডিআর ক্যাম্পে কথা হয় জওয়ান ও কমান্ডারদের সঙ্গে। ক্যাম্প গুলোতে বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তারা আসলেই খুব কস্টের চাকরি করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত সীমান্ত পাহারা দিলেও তাদের খবর কেউ তেমন একটা রাখেন না। অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে তাদের বেতন বৈষম্য, পদোন্নতি বৈষম্য সবসময়ই পীড়া দেয় বিডিআর জওয়ানদের। সারাজীবন চাকরি করলেও মহাপরিচালক বা সেক্টর কমান্ডার হওয়াতো দূরের কথা, ব্যাটালিয়ান কমান্ডার হওয়ারও সুযোগ নেই। সরাসরি না বললেও বিডিআর জওয়ানরা এসব বিষয়গুলো ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়ার চেস্টা করেন। সারাদিন ব্যাপি তেতুলিয়া ও আশেপাশের সীমান্ত এলাকায় বিডিআর ক্যাম্পগুলো ঘুড়ে সন্ধ্যায় আবার পঞ্চগড়। সেখান থেকে পরেরদিন ভোর ৫টায় দিনাজপুরের পথে রওয়ানা। দিনাজপুর যাওয়ার পথে ঠাকুরগাঁও জেলায় ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। সেই সীমান্ত ঘুড়ে পৌঁছাই দিনাজপুর শহরে। সেখানে খুবই ইচ্ছা ছিল সেক্টর কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু সেক্টর কমান্ডার মিটিং-এ আছেন বলে সময় দিতে চাইলেন না। মোবাইলে কথা হয়। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

পরবর্তীতে কোন সময় আসলে দেখা হবে। দিনাজপুর থেকে নীলফামারির উদ্দেশ্যে রওয়ানা। নীলফামারিতে জেলা প্রতিনিধি ভুবন রায় নিখিল প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মটর সাইকেলে করে ডোমার ও ডিমলা উপজেলা সীমান্ত এবং বিডিআর ক্যাম্পগুলোতে পৌঁছাই। সীমান্ত ঘুরার পর মটর সাইকেলেই তিস্তা ব্রিজ হয়ে লালমনিরহাট জেলায় প্রবেশ। টানা ৮ ঘণ্টা মটর সাইকেল যাত্রা। রাস্তায় ছিল গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। তিস্তা ব্রিজের অপর প্রান্তে লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা প্রতিনিধি সাজু মটর সাইকেল নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। সেখানেও এক মটর সাইকেলে ৩ জন। রাস্তায় প্রচণ্ড বৃষ্টি। এক পর্যায়ে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় আশ্রয় নেই। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতেই আবারো মটর সাইকেল নিয়ে রওয়ানা। ততোক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে অন্ধকার নামে। রাত ৮ টায় হাতিবান্ধা উপজেলা সদরে পৌঁছাই। সেখান থেকে বাসে লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে যাত্রা। লালমনিরহাট পৌঁছে আমার দেশ-এর জেলা প্রতিনিধি হাসানুল আজিজকে পাই। আগে থেকেই হোটেল সীট বরাদ্দ দিয়ে রাখতে বললেও তিনি সেটা করেননি। এজন্য একটি হোটেলের পঞ্চম তলায় বাজে রুমে রাত কাটাতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে পাটগ্রামের দহগ্রাম- আঙ্গরপোতার পথে রওয়ানা। হাসানুল আজিজ প্রথমে বাসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল বাসে গেলে দহগ্রাম আঙ্গরপোতা ঘুড়ে আবার লালমনিরহাট ফেরা সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত একটি প্রাইভেটকার ভাড়া করা হয়। হাতিবান্ধা থেকে উপজেলা প্রতিনিধি সাজু, পাটগ্রাম থেকে উপজেলা প্রতিনিধি আমিনুর রহমান সঙ্গী হয়। তাদের নিয়ে ভারতের তিনবিঘা করিডোর পার হয়ে দহগ্রামে পৌঁছি। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ইউনিয়ন জুড়ে হল একটি ছিট মহল। এই ছিটমহল দেখার আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল দীর্ঘদিনের। এই ছিটমহল নিয়ে পৃথক একটি প্রতিবেদন রয়েছে। এজন্য এখানে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না। ছিটমহলে পৌঁছার পর সেখানকার সাধারণ মানুষ তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখানোর জন্য নিয়ে যায় তিস্তা নদীর ভাঙ্গন দেখাতে। রাস্তায় জুতা কোথায় রেখে যাবো এ নিয়ে যখন আমরা ভাবছিলাম তখন একজন বৃদ্ধ বললেন, যেখানে খুশি রেখে যান। কেউ ধরবে না। এটা সৌদীআরব। এখানে কোন চুরি হবে না। কাদা পানিতে হেটে মাঠ পেরিয়ে তিস্তা নদী। নদী গ্রাস করছে ছিটমহলের। তাদের রক্ষার কোন উদ্যোগ কারো নেই। জেনারেল মইন ইউ আহমদ একবার ছিটমহল রক্ষার জন্য নদীতে বাঁশ দিয়ে তীর সংরক্ষণের কর্মসূচি উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু সেই বাঁশ পরেরদিনই ভেসে গেছে। এর পর আর কেউ খবর রাখেনি। এজন্য ছিটমহলবাসী জেনারেল মইনকে প্রতারক হিসাবে চিহ্নিত করে।

www.pathagar.com

ছিটমহল ঘুরে বিকালে বুড়িমারি স্থল বন্দরে। সেখানে পৌঁছাতে কয়েকটি বিডিআর ক্যাম্পে কথা হয় জওয়ান ও ক্যাম্প কমান্ডারদের সঙ্গে। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলেও রয়েছে ৩টি বিডিআর ক্যাম্প। তাদের বিপরীতে ভারতের পাহারার জন্য রয়েছে ১৮টি বিএসএফ ক্যাম্প। প্রতি ক্যাম্পে একটি বিডিআর ক্যাম্পের তুলনায় ৩ গুন বেশি বিএসএফ সদস্য। স্থল বন্দর ঘুরে লালমনিরহাট ফেরার পথে পাটগ্রাম ও হাতিবান্দা সীমান্তে আরো কয়েকটি বিডিআর ক্যাম্প পরিদর্শনে যাই। কোনটিতে গাড়ি নিয়ে আবার কোনটিতে রাস্তায় গাড়ি রেখে অনেক পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। রাতে আবার লালমনিরহাটে ফিরি। ভোরে আবারো লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাট সীমান্তে যাই। সেখানে বৃটিশ আমলের রেল স্টেশনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রয়েছে। রেল লাইনের পরিত্যক্ত লোহা লক্করও রয়েছে এখানে। মোগলহাটের পরিত্যক্ত রেল স্টেশন ঘেঁষেই সীমান্ত। এখন আর এই রেল লাইন কার্যকর নেই। এখানে ধরলা নদীর ওপর একটি রেল সেতু ছিল। সেতুর পিলারগুলো এখনো কালের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রেল স্টেশন ঘেঁষে পুরো নদীটি ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে পড়ছে। তবে স্টেশন ঘেঁষে নদীর তীরে ১৫টি পরিবারের একটি ছোট গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামের সবাই মুসলমান। তারা ভারতীয় নাগরিক। নদীর কারণে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গেই তাদের সামাজিকতা, হাটবাজার। ছেলে-মেয়েরাও বাংলাদেশের স্কুলেই পড়া-লেখা করে। শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হলে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যায় তারা।

মোগলহাট রেল স্টেশনের পাশেই রয়েছে বিডিআর-এর কোম্পানী সদর। এই কোম্পানী সদর ও আশেপাশের বিডিআর ক্যাম্পগুলো ঘুরে চলে যাই লালমনিরহাটের আদিতমারি উপজেলার সীমান্ত এলাকায়। সেই সীমান্তের বিডিআর ক্যাম্প ও তাদের যাতায়াত ব্যবস্থা আরো করুন। টহলের সময় ছোট খাল পার হতে হলেও পাবলিকের নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অপরদিকে ভারতের বিএসএফ-এর নদী ও খাল পারাপারের জন্য রয়েছে অত্যাধুনিক স্পীডবোট। আদিতমারি উপজেলার দূর্গাপুর সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন সীমান্ত ও বিডিআর ক্যাম্পগুলো ঘুরে আবার লালমনিরহাটে। সেখান থেকে পরেরদিন কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলা সীমান্ত এলাকার দিকে রওয়ানা। লালমনিরহাট থেকেই সঙ্গে ছিলেন ফুলবাড়ি উপজেলা সংবাদদাতা আনন্দ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শিমুলবাড়ি ঘাট দিয়ে ফুলবাড়িতে প্রবেশ। সেখানে পৌঁছে দুপুরের খাবার সেরেই সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। প্রথমেই ফুলবাড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি ছিটমহলে। মাত্র ৬টি পরিবার বাস করে এখানে। ৯৩২ নং পিলারের

www.pathagar.com

ভেতরে ভারতীয় ৭৫ গজ ভূমি অতিক্রম করে ছিট করলা-২। ছিটমহলটি দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে। দুটি মটর সাইকেলে করে আমরা চার জন যাচ্ছিলাম। সীমান্তের কাছে একটি কাঁচা রাস্তায় মটর সাইকেলগুলো রেখে প্রবেশ করি সেখানে। মাত্র ৭০ বিঘা জমি নিয়ে এই ছিটমহল । আমাদের ছিটমহলে যাওয়ার বিষয়টি টহলরত বিডিআর-এর চোখে পড়ে। মটর সাইকেল রেখে যাওয়ায় তারা অপেক্ষা করতে থাকে। ছিটমহলের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে ফেরার পথে বিডিআর আমাদের থামায়। নানা জেরা করে। সাংবাদিক পরিচয় দিলে পরিচয় পত্র দেখতে চায়। ভারতীয় ভূমি অতিক্রম করে কেন ছিট মহলে প্রবেশ করেছি জানতে চায় বিডিআর। বিএসএফ ধরে নিয়ে গেলে দায়টা কার ওপর যেতো এই প্রশ্ন করেন তারা। কোন উত্তর নেই আমাদের। এধরনের ভুল না কারার পরামর্শ দেয়। কোথায়ও এরকম ভূমি অতিক্রম করতে হলে বিডিআর-এর সহযোগিতা নেয়া বা আগে ইনফরম করার জন্য বলে দেয়। সেখান থেকে বালারহাট বিডিআর ক্যাম্প হয়ে বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় ছিটমহল দাসিয়ার চড়ায় পৌঁছাই। সেখানে অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। দাসিয়ার চড়ার মানুষ ভারতের ভূমিতে বাস করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। কারন বাংলাদেশের ভূমি অতিক্রম করে ভারতের মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ তেমন একটা নেই। এই ছিটমহলের ভেতরেই আবার রয়েছে বাংলাদেশের একটি ছিটমহল। এটাকে বলা হয় ছিটের ভেতরে ছিট।

ফুলবাড়িয়া উপজেলায় সীমান্তে ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের আরো ছিটমহল রয়েছে। এরমধ্যে ছিট মোস্তাফি ও ছিটকরলা-১ ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে নিয়ে গেছে। এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এই ছিটমহলের নাগরিকরা। তারা চাইলেই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। আসতে পারে না নিজ দেশের মূল ভূখণ্ডে। সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অনেক চেষ্টা করেও এই ছিটমহল গুলোতে প্রবেশের কোন সুযোগ পাওয়া যায়নি। এই দুই ছিটমহলে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ নাগরিক সুবিধাবিহীন মানবেতর জীবনযাপন করছে।

সারাদিন ফুলবাড়ি উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ঘুরে বিকালে কুড়িগ্রামের বুরুঙ্গামারিতে। ফুলবাড়ি থেকে সঙ্গী হন বুরুঙ্গামারি উপজেলা সংবাদদাতা আমিনুর রহমান বাবু। তিনি একজন স্কুল শিক্ষকও। বুরুঙ্গামারিতেও রয়েছে অনেকগুলো ছিটমহল। ভারতের অভ্যন্তরে ১০টি ছোট ছিটমহল মিলে এখানে মশালডাঙ্গা ছিট। লোকসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। এই ছিটমহলগুলো ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। চাইলেই মূলভূখন্ডে আসতে পারে না ছিটমহলের

www.pathagar.com

মানুষ। এই উপজেলার সীমান্তে বাশজানি গ্রামটিতে অবস্থিত মসজিদে বাংলাদেশ এবং ভারতের মুসলমানরা একত্রে নামাজ আদায় করে।

বুরুঙ্গামারি ঘুরে রাতে রওয়ানা দেই কুড়িগ্রাম শহরের দিকে। রাত প্রায় সাড়ে ১১টায় কুড়িগ্রামে পৌছাই। সেখানে আগে থেকেই আমার দেশ-এর জেলা প্রতিনিধি হাসিব ভাই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একজন কলেজ শিক্ষকও বটে। কুড়িগ্রামেই রাত্রি যাপন। ভোরে আবার রৌমারির উদ্দেশ্যে রওয়ানা। কুড়িগ্রাম জেলা প্রতিনিধি হাসিব ভাই মটর সাইকেলে করে চিলমারি বন্দর পর্যন্ত পৌছে দেন। চিলমারি বন্দর থেকে ব্রহ্মপুত্র পার হতে প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা সময় লাগে। ইঞ্জিনের নৌকায় পার হতে হয় ব্রহ্মপুত্র নদী। বেলা ২টায় ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ে। সাড়ে ৫টায় রাজিবপুর ঘাটে পৌছায়। সেখানে অপেক্ষায় ছিলেন রৌমারি ও রাজিবপুর প্রতিনিধি আতাউর রহমান। তিনিও স্কুল শিক্ষক। নৌকায় উঠার আগেই চিলামারিতে দুপুরের খাবার সেরে নেয়ায় রাজিবপুর পৌছে আর দেরি নয়। ব্যাগ একটি এনজিও রেস্ট হাউসে রেখেই বরাইবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা। মটরসাইকেলে অর্ধেক রাস্ত া যাওয়ার পর একটি বিল পার হতে হয় নৌকায়। খাল-বিল, নদী-নালা পার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে রৌমারির বরাইবাড়িতে পৌছাই। এক বিরল অভিজ্ঞতা। একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো অবস্থানে বরাইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্প। যেখানে ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধের পর থেকে বরাইবাড়ি ক্যাম্প দেখার কৌতুহল ছিল। অফিসের অ্যাসাইনমেন্টের সুবাদে আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন সেই কৌতুহল পূরণ করলেন। বরাইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্পের হাবিলদার পুরো এলাকা আমাদের ঘুরে দেখান। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন না। তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁর। ক্যাম্পের দেয়ালে এখনো শত শত বুলেটের আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। শহীদ দুই বিডিআর জওয়ানের নামে স্থানীয় মানুষ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে।

এই যুদ্ধের সময় বিডিআর প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল (অব) আ ল ম ফজলুর রহমান। তিনি একাধিক সভা ও সেমিনারে জানিয়েছেন বরাইবাড়ি যুদ্ধে চার শতাধিক বিএসএফ নিহত হয়েছিল। অপরদিকে প্রাণ হারান দুই বিডিআর জওয়ান। তিনি এ প্রসঙ্গে আমার দেশ-এর সঙ্গে কথা বলার সময় জানান, বিডিআর-এর অসীম সাহস, এলাকার মানুষের সার্বিক সহযোগিতার কারনে বরাইবাড়ি যুদ্ধে ভারতে বিশাল শক্তিধর বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাণ হারাতে হয়েছিল চার শতাধিক ভারতীয় বিএসএফ। এতো বড় পরাজয়ের দুঃখ ভারত কখনো ভুলতে পারে না। এজন্যই তারা বাংলাদেশের বিডিআরকে ধ্বংস করার নানা ষড়যন্ত্র ও কৌশল খুঁজতে থাকে।

www.pathagar.com

সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান জানান পদুয়া হাতছাড়া হওয়ার প্রতিশোধ নিতে বিএসএফ বরাইবাড়িতে আক্রমণ করেছিল। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের পদুয়া দখলে রাখে। ২০০১ সালের এপ্রিলে মাত্র কয়েকজন সাহসী বিডিআর জওয়ান পদুয়া পুনরুদ্ধার করে। বিনা রক্তপাতে পদুয়া ক্যাম্পের বিএসএফকে আত্মসমর্পনে বাধ্য করা হয় সেদিন। তারপর ভারত পদুয়া দখলে মরিয়া হয়ে উঠে। পদুয়ার পাশে ভারতের অভ্যন্তরে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। কিন্তু বিডিআর এর কৌশলের কাছে পরাজিত হয়। কিন্তু বিডিআর-এর কর্মরত সেনা অফিসারদের যুদ্ধ কৌশল ও অসীম সাহসী জওয়ানদের কারণে তা সম্ভব হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রৌমারিতে আক্রমণ করে বিএসএফ। কিন্তু সেখানেও পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ও ভারত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর পদুয়া ছেড়ে চলে আসে বিডিআর। আবারো ভারতীয় বাহিনীর অপদখলে চলে যায় পদুয়া। পদুয়া ছেড়ে আসলেও উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রথমবারের মতো ভারত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় এটা বাংলাদেশেরই অংশ। এর আগে ১৯৯৯ সালের ২৫ আগস্ট দিনাজপুরের হিলি স্থল বন্দরের কাছেও একবার ভারতীয় বাহিনী প্রবেশ করেছিল। তখনো বিডিআর তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। এই যুদ্ধেও ভারতের বিএসএফ পরাজিত হয়। প্রাণ হারায় ১৭ জন বিএসএফ সদস্য। অপর দিকে হিলির যুদ্ধে আহাদ নামে একজন বিডিআর জওয়ান ও হারুন নামে একজন সাধারণ মানুষ প্রাণ হারায়। দেশের জন্য তারা শাহাদাৎ বরণ করে। সন্ধ্যার পর রৌমারির বরাইবাড়ি থেকে আবারো খাল-বিল, নদী-নালা পার হয়ে রাজিবপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। রাজিবপুর যাওয়ার পথে রাতেই কয়েকটি বিডিআর ক্যাম্পে যাত্রা বিরতি। কথা হয় জওয়ান ও অফিসারদের সঙ্গে রৌমারির বিভিন্ন সীমান্ত দেখে পরেরদিন আবার কুড়িগ্রামে। সেখান থেকে রংপুর হয়ে ঢাকা।

ঢাকায় এসে একদিন পর আবারো চাপাইনবাবগঞ্জে। চাপাইনবাবগঞ্জে সীমান্ত এলাকায় যাতায়াতে সঙ্গ দেয় জেলা প্রতিনিধি ইমতিয়াজ সুইট ও শীবগঞ্জ প্রতিনিধি আহসান হাবিব। চাপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকাগুলো আরো বেশি দুর্গম। কাঁদামাটির পথ মারিয়ে পৌছাতে হয় সীমান্ত এলাকার বিডিআর ক্যাম্প গুলোতে। চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে নওগার বিভিন্ন উপজেলা সীমান্ত। নওগাঁ প্রতিনিধি শেখ আনোয়ার সহ স্থানীয় উপজেলা প্রতিনিধিরা সহযোগিতা করে সীমান্ত পথে। নওগাঁর একটি দুর্গম বিডিআর ক্যাম্পে পৌছার পর আমাদের বসানো হয় ক্যাম্প এরিয়ার ভেতরে। মেহমান বসানোর জন্য প্রত্যেক বিডিআর ক্যাম্প এরিয়ায় একটি খোলা জায়গা রয়েছে। শুধু উপরে ছাউনি দেয়া। এই জায়গাটিতে বসে ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলার সময়

www.pathagar.com

তিনি যোগাযোগ করেন ব্যাটালিয়ান কমান্ডারের সঙ্গে। আমাদের সামনেই টেলিফোনে জানান কয়েকজন সাংবাদিক এসেছে। বোঝা গেল ব্যাটালিয়ান কমান্ডার বলে দিয়েছে কোন কথা না বলার জন্য। একটু পরই আবার ব্যাটালিয়ান কমান্ডার রিং ব্যাক করে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প কমান্ডার উঠে বাইরে চলে যান। কথা বলেন তাঁর ব্যাটালিয়ান কমান্ডারের সঙ্গে। কথা শেষ করে চেহারাটা মলিন করে আমাদের কাছে আসলেন। চেহারায় ফুটে উঠে একটা কিছু হয়েছে। আমি তাঁর চেহারা দেখেই বুঝলাম আর বসা উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে বললাম আমরা আসি। ক্যাম্প কমান্ডারও বললেন আসেন আমরা ক্যাম্প এরিয়ার বাইরে গিয়ে বসি। আপনারা আমাদের ক্যাম্প এরিয়ার ভেতরের বসার স্থানে এসেছিলেন এবং আপনাদের চা খাওয়ানো হয়েছে এসব কিছুই কোথায়ও বলবেন না। আপনারা ক্যাম্পের ভেতরে আসেননি এক রকম চোখের পানি ছেড়ে দিয়েই কথাগুলো বললেন ওই ক্যাম্প-কমান্ডার।

নওগাঁ, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফিরে আবারো সিলেটে রওয়ানা। সিলেটে পৌঁছে ব্যাগ হোটেলে রেখেই পদুয়ার পথে যাত্রা। সঙ্গে সীমান্ত উপজেলা জৈন্তাপুরের প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন। সিলেট থেকে জৈন্তাপুর জাফলং হয়ে পদুয়ায় যেতে হয়। তবে ভারতের দখলে থাকায় পদুয়া এলাকায় প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। জৈন্তাপুর উপজেলার অনেকগুলো সীমান্ত পিলার বিএসএফ দীর্ঘদিন থেকেই বিডিআরকে পরিদর্শন করতে দিচ্ছে না। সীমান্ত পিলারের ভেতরে বাংলাদেশের জমি তারা দখল করে রাখায় যৌথ পরিদর্শন সম্ভব হচ্ছে না বলে জানায় স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পগুলোর জওয়ানরা। জৈন্তাপুর-পদুয়া সীমান্ত যাত্রায়ও ছিল রোদবৃষ্টি। বৃষ্টিতে ভিজে রোদে শুকাতে হয়েছে। রাত ১০টা পর্যন্ত এক বিডিআর ক্যাম্প থেকে আরেক বিডিআর ক্যাম্পে। রাতে সিলেট ফেরার পথে মুষলধারে বৃষ্টি। রাত প্রায় সাড়ে ১২টায় সিলেট শহরে নেমে বৃষ্টিতে ভিজে হোটেলে। সকালেই আবার জকিগঞ্জের দিকে যাত্রা। আমার দেশ-এর জকিগঞ্জ প্রতিনিধি এখলাসুর রহমান আগে থেকেই সিলেটে এসে অপেক্ষায় ছিলেন। জকিগঞ্জে পৌঁছার পর থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই অমলসিদ সীমান্তে ভারতের বরাক নদী থেকে সুরমা-কুশিয়ারা নদীর উৎপত্তির স্থলে। কারণ বরাক নদীর উজানে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে দেশব্যাপি আন্দোলন। একারণে বরাক নদীর সেই সীমান্তটি দেখার কৌতুহল থেকেই সেখানে যাওয়া। বৃষ্টিতে ভেজে সেখান থেকে আবারো জকিগঞ্জ উপজেলা সদরে। বৃষ্টির মধ্যেই মটর সাইকেলে বিএসএফ- এ নানা তৎপরতা ও বাংলাদেশের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপনা নির্মাণে বাধা দেয়া স্থানগুলো দেখতে যাওয়া। বৃষ্টি আর কাদা পানিতে একাকার জামা কাপড়। তারপরও থেমে নেই কাজ। যে কোন উপায়ে সীমান্ত এলাকার

www.pathagar.com

সমস্যাগুলো তুলে আনতে হবে। রাতে জকিগঞ্জ থেকে আবারো সিলেটে। রাত সাড়ে ১১টার পর সিলেটে পৌঁছাতে হয়েছে। হোটেলে রাত্রি যাপনের পর সকালে ঘুম থেকে উঠেই মৌলভীবাজারে। মৌলভীবাজার সীমান্তের পথে সঙ্গী ছিলেন জেলা প্রতিনিধি শাহ অলিদুর রহমান। মৌলভী বাজার সীমান্তের পর হবিগঞ্জের বাল্লা ও মাধবপুরে বিভিন্ন সীমান্ত পরিদর্শনে সঙ্গি হন চুনারুঘাট প্রতিনিধি আলমগীর ও মাধবপুর প্রতিনিধি আলাউদ্দিন আল রনী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ও কসবা সীমান্ত এলাকা এবং বিডিআর ক্যাম্প পরিদর্শনে সঙ্গে ছিলেন আখাউড়া প্রতিনিধি জুটন বণিক ও কসবা প্রতিনিধি অতুল।

এই সীমান্ত এলাকা ঘুরতে সময় লেগেছে প্রায় একমাস। সরেজমিনে ঘুরে, বিডিআর জওয়ান, এলাকার সাধারণ মানুষ সহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে তৈরি করা হয় ধারাবাহিক ১৮টি প্রতিবেদন। উঠে আসে সীমান্তের নানা সমস্যার বাস্তব চিত্র ২০০৯ সালের ১০ আগস্ট থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর সমন্বয়ে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বাইরে আরো কিছু তথ্য বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ শুরু হওয়ার পর দেশ ও বিদেশ থেকে অনেক ফোন আসতে থাকে। আমেরিকা ও কানাডা থেকে উচ্চ শিক্ষিত প্রবাসী বাংলাদেশী অনেকে ফোন করেন। একযুগের বেশি সাংবাদিকতা পেশায় কোন প্রতিবেদনের জন্য এরকম সাফল্য আমি পাইনি। অনেকেই প্রতিবেদনগুলোর সমন্বয়ে বই প্রকাশেরও অনুরোধ করেন। আমার নিজের কাছেও মনে হয়েছে মাঠে-ময়দানে ঘুরে এভাবে প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে রিয়েল সাংবাদিকতা। কারণ এই প্রতিবেদনের পেছনে ঘুরতে এমন কোন দিন নেই বৃষ্টিতে ভিজিনি, রোদে পুরিনি। এমনো হয়েছে কাদায় হাঁটতে গিয়ে পুরো প্যান্ট কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। হোটেলে ফিরে প্রতিদিন প্যান্ট পরিষ্কার করতে হতো।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, প্রতিবেদনগুলো প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হয়েছিল। কারণ বিডিআর তখন খুবই চাপের মধ্যে। এজন্য যে সব বিডিআর জওয়ান ও ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি তাদের নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। তারাও বারবার অনুরোধ করেছেন কোন লেখায় নাম পরিচিতি যেন উল্লেখ না করা হয়।

www.pathagar.com

পাহারায় নিরস্ত্র বিডিআর

সীমান্ত পাহারায় বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) দিন কাটে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। বিডিআর সীমান্তে নিয়মিত রুটিন টহল দিলেও আগের উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। কখন কে আটক হয়ে জেলে যেতে হয় এই আতঙ্ক এখনও কাটেনি। সীমান্ত ক্যাম্পগুলোতে (বিওপি) বিডিআর সস্যদের হাতে সীমিত অস্ত্র থাকলেও ব্যাটালিয়নগুলোর অস্ত্র এখনও পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। এমনকি অনেক কোম্পানি সদরের ভারী অস্ত্রও বিডিআরের নিয়ন্ত্রণে নেই। কয়েকটি বিওপি মিলে হচ্ছে একটি কোম্পানি সদর বিডিআর অনেকটা অস্ত্রবিহীন অবস্থায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন। সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিলে বা আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ পাবেন কিনা এটা জানে না বিডিআর সদস্যরা। একটি বিওপি আক্রান্ত হলে পার্শ্ববর্তী বিওপির অস্ত্রই হচ্ছে বিডিআরের মূল ভরসা। সেকেন্ড লাইন বা ব্যাটালিয়ন থেকে অস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানোর কোনো সুযোগ আপাতত নেই। নিয়ম অনুযায়ী কোনো বিওপির নিয়ন্ত্রিত এলাকার সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি সদর বা ব্যাটালিয়ন থেকে বাড়তি অস্ত্রসহ জওয়ানরা তাদের সঙ্গে বাড়তি শক্তি হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু বর্তমানে ব্যাটালিয়নগুলোর অস্ত্র পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকায় বিডিআর জানেন না কোথা থেকে তারা প্রয়োজনে বাড়তি সহযোগিতা পাবেন। এমনকি ব্যাটালিয়নের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যারা ডিউটিতে আসেন, তাদের সঙ্গেও অস্ত্র থাকে না। ব্যাটালিয়ন কমান্ডারদের সঙ্গে ডিউটি করার সময় বিডিআর জওয়ানরা শুধু লাঠি বহন করেন। সীমান্ত এলাকার গ্রামের মানুষরাও নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করছে। এতে সীমান্ত জুড়ে চোরাচালান ও অন্যান্য অপরাধ এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের অত্যাচার আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন সীমান্ত গ্রামের মানুষরা।

গত ২৮ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া, দিনাজপুরের বিরামপুর, হাকিমপুর, হিলি, জয়পুরহাটের পাঁচবিবির আটাপাড়া, নীলফামারীর ডোমার, চিলিরহাট, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, দহগ্রাম, হাতিবান্দা, সদর, আদিতমারী, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী, রাজীবপুর, রৌমারীসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্তে বিডিআর-এর বিওপি, কোম্পানি সদর সরেজমিন ঘুরে বিডিআর সদস্য ও সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই চিত্র পাওয়া গেছে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার পর কেমন আছেন সীমান্ত এলাকা তাই অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য।

২৫-২৬ মানেই বিডিআরের কাছে এক আতঙ্ক। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে ঘটে যাওয়া হত্যাযজ্ঞের ঘটনা এখন

www.pathagar.com

বিডিআরকে তাড়া করে বেড়ায়। এতে এই বাহিনীতে চাকরি করাটাও নিরাপদ মনে করছেন না অনেকে।

বিভিন্ন বিওপি এবং কোম্পানি সদরে বিডিআর জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে তারা এখন মান-সম্মান নিয়ে মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানদের কাছে ফেরত যেতে চান। বিওপি ও কোম্পানি সদরে যাদের সঙ্গেই কথা বলেছি সবাই জানান, চাকরির বয়স ২৫ বছর উত্তীর্ণদের অবসরে যাওয়ার সুযোগ দিলে কেউ এই বাহিনীতে আর থাকবেন না। কয়েকজন বিডিআর জওয়ান ও বিওপি কমান্ডার এমনও বলেছেন প্রয়োজনে বাড়ি গিয়ে রিকশা চালাব, তবু এ রকম আতঙ্ক ও অপমানে আর থাকতে চাই না। এর কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, 'এখন আল্লাহর ওপর জীবন ছেড়ে দিয়ে দিন গুনছি আর রাত কাটাচ্ছি। মা মরা ও বাবা মরা এতিমের মতো আছি। বিডিআরে চাকরি করাটাই হচ্ছে অপমানজনক। এখন কোনো মতে দিন কাটে আর রাত যায়।' তারা আরও বলেন, যারা অপরাধ করেছে তারা তো অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্য। কিন্তু নিরপরাধ অনেকেই কঠিন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তারা বলেন, রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড রক্ষার দায়িত্ব পালনে কর্মরত ২১৩ বছরের পুরনো এই বাহিনীতে চাকরি করে বিডিআর জওয়ানরা গর্ববোধ করতেন। এখন আর এই গর্ব নেই। এখন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রয়েছে অজানা আতঙ্ক।

এদিকে বিডিআরের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে নতুন নিয়োগ ও অবসরে যাওয়া বন্ধ রয়েছে। এমনকি গত ২৫ ফেব্রুয়ারির পর যাদের চাকরির বয়স ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে, তাদেরও অবসরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আপাতত বন্ধ রয়েছে আসরে যাওয়া। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চাকরির বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ইচ্ছা করলে অবসরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিডিআর বর্তমানে এই সুযোগটি স্থগিত থাকায় কেউ চাইলেই অবসরে যেতে পারছেন না। বিওপিগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের কাছে সীমিত অস্ত্র আছে। তবে কোম্পানি সদর এবং ব্যাটালিয়নগুলোর অস্ত্র পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। বিডিআরের অস্ত্র পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারিতে পিলখানায় হত্যাযজ্ঞের পর সরকারি সিদ্ধান্তে বিডিআরের অস্ত্র ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়। বিওপিগুলো ছাড়া বাকি সবার অস্ত্রই পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ব্যাটালিয়ন সদরে কর্মরত বিডিআর জওয়ানদের নিরস্ত্র করার পর থেকে এখনও অস্ত্র সরবরাহ করা হয়নি।

ব্যাটালিয়নগুলো থেকে যেসব বিডিআর সদস্যকে বিওপিতে পোস্টিং দেয়া হয়, তারা বিনা অস্ত্রে আসেন। বিওপিগুলোর কেউ ছুটিতে থাকলে তার রেখে যাওয়া অস্ত্রটি সাময়িক বরাদ্দ পান ব্যাটালিয়ন থেকে বিওপিতে পোস্টিং পাওয়া বিডিআর সদস্য। উত্তরাঞ্চলে কোম্পানি সদর থেকে বিভিন্ন পিওপিতে পোস্টিং পাওয়া বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে কথা বললে তারা সত্যতা স্বীকার করেন। তারা বলেন, ব্যাটালিয়নে থাকার সময় তাদের নামে বরাদ্দ পাওয়া অস্ত্রটি ২৫ ফেব্রুয়ারির পর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে জমা নেয়া হয়েছে। এরপর আর ফেরত পাননি। এ জন্য নিরস্ত্র অবস্থায়ই সীমান্ত পাহারায় বিওপিতে পোস্টিং

www.pathagar.com

পেয়েছেন। তারা বলেন, তাদের নামে বরাদ্দ পাওয়া অস্ত্রটি পুলিশের জিম্মা থেকে ফেরত পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত তাদের নিজস্ব অস্ত্রের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

জয়পুরহাট ব্যাটালিয়ন থেকে হিলি এলাকার একশটি বিওপিতে নিয়োগ পাওয়া এক বিডিআর সদস্য বলেন, তিনি অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এখানে যোগ দিয়েছেন। অস্ত্রটি পুলিশের কাস্টডিতে থাকায় এখানে নিরস্ত্র অবস্থায় যোগদান করতে হয়েছে। ছুটিতে থাকা এ বিডিআর জওয়ানের অস্ত্রটি আপাতত তার ভরসা। তার নামে বরাদ্দ থাকা অস্ত্রটি কবে ফেরত পাবেন এটাও জানেন না তিনি। ব্যাটালিয়ন থেকে বিভিন্ন বিওপিতে যোগ দেয়া জওয়ানরা সবাই এ রকম অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

হিলির স্থলবন্দর চেকপোস্টে কর্মরত একজন বিডিআর কর্মকর্তা বলেন, অস্ত্র বিডিআরের ব্যাটালিয়নেই আছে। তবে যেখানে রাখা হয়েছে চাবিটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। আশা করি খুব শিগগিরই তা বিডিআরের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। সীমান্তে উত্তেজন দেখা দিলে বা বাড়তি শক্তি ও অস্ত্রের প্রয়োজন হলে কি করবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী বিওপিগুলোতে যেসব অস্ত্র রয়েছে, সেগুলো নিয়ে তারা এগিয়ে আসবে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বিওপি তো অনেক দূরে এবং তাদের নিজস্ব কোনো যানবাহন নেই। কিভাবে দ্রুত শক্তি যোগান দেবে বা তখন পার্শ্ববর্তী বিওপিগুলোর বিরাপত্তা কে দেবে পাল্টা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সেটা সরকার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তখন সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিডিআর জওয়ান, বিওপি কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির আগে সেনাবাহিনী থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার বা কমান্ডিং অফিসাররা মাসে একাধিকবার তাদের বিওপি ও কোম্পানিতে আসতেন। কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গে রাত যাপনও করতেন। কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারির পিলখানা হত্যাযজ্ঞের পর থেকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার বা কমান্ডিং অফিসার হিসেবে কর্মরত সেনা অফিসররা আগের মতো নিয়মিত বিওপি ও কোম্পানি সদর পরিদর্শনে যান না। বিওপি বা কোম্পানি পরিদর্শনে অল্প সময়ের জন্য আসেন। নীলফামারীর ডোমার সীমান্তে একজন বিওপি কমান্ডার বলেন, ব্যাটালিয়ন থেকে দুই মাসেও একবার কেউ আসেন না। আগে মাসে দু'বারও আসতেন। মাঝে-মধ্যে এখানে থাকতেনও। এখন খুব কম তারা কোম্পানি সদর ও বিওপি পরিদর্শনে আসেন। এ রকম অনুভূতি জানিয়েছেন লালমনিরহাটের পাটগ্রাম ও হাতিবান্দা সীমান্তের আরও কয়েকটি বিওপি কমান্ডার। ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর কোনো কমান্ডিং অফিসার কোম্পানি সদর বা বিওপিতে রাতও যাপন করেন না। এমনকি দীর্ঘদিন কমান্ডিং অফিসার হিসেবে কর্মরত সেনা কর্মকর্তারা ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারেও রাত যাপন করেননি। ব্যাটালিয়নের পার্শ্ববর্তী ক্যান্টমেন্ট বা সরকারি কোনো রেস্ট হাউসে তারা রাত যাপন করতেন। মাসখানেক ধরে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে কর্মরত সেনা কর্মকর্তারা কোনো কোনো ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে অবস্থান আবার শুরু করেছেন। তবে ব্যাটালিয়ানে কর্মরত বিডিআরদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই।

www.pathagar.com

পায়ে হেঁটে টহল দেয় বিডিআর

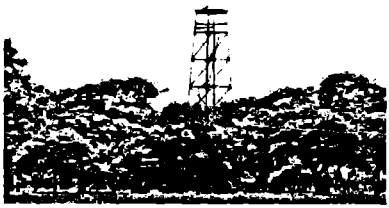

বিডিআরের একটির বিপরীতে বিএসএফের ২ থেকে ৬টি বিওপি। ১০০ থেকে ২০০ গজ পরপর পর্যবেক্ষণ পাওয়ার। কাঁটাতারের বেড়ার পাশে ভারতের রয়েছে রিংরোড

সীমান্ত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের (বিওপি) সীমিত অস্ত্র নিয়ে কয়েকগুণ বেশি শক্তিধর ভারতীয় বিএসএফের মোকাবিলায় দায়িত্ব পালন করছে বিডিআর। কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তে পাকা রিংরোড, পর্যাপ্ত যানবাহন ও উন্নত অস্ত্রের অধিকারী বিএসএফের মোকাবিলায় বিডিআরের মনোবলই ছিল এতদিন মূল শক্তি। বিডিআরের সেই মনোবল এখন আর অটুট নেই। বিওপিগুলোর যানবাহন শূন্যতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিডিআরের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার সীমান্ত ঘুরে দেখা গেছে একেবারে সীমান্তের কাছে অজপাড়াগাঁয়ে অবস্থিত বিওপিগুলোয় কোনো রকমের যানবাহন নেই। টহলের জন্য নেই রাস্তার সুবিধা। সীমান্ত পর্যবেক্ষণের জন্য নেই কোনো টাওয়ার। মানুষের বাড়ির উঠান, কৃষকের ক্ষেতের আইল, গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে নিয়মিত মাইলের পর মাইল হেঁটে সীমান্তে টহল দেয় বিওপিগুলোতে কর্মরত বিডিআর জওয়ানরা। উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়, দিনাজপুর, জয়পুহাট, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার সীমান্ত এলাকা ঘুরে টহলের এই দৃশ্য দেখা গেছে। অপরদিকে ভারতীয় বিএসএফ বাহিনীর বিওপিগুলোতে রয়েছে পর্যাপ্ত গাড়ি, পিকআপ, মোটরসাইকেল ও বাইসাইকেল। সীমান্তে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে বিএসএফ টহলের জন্য রয়েছে পাকা রিংরোড। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষায় দায়িত্ব পালন কারী বিডিআরদের মতে, এই রিংরোড শুধু ভারতীয় বিএসএফকে টহলের সুবিধাই দেয় না, রণকৌশলের দিক থেকেও গুরুত্ব বহন করে। যুদ্ধের সময় রিংরোডকে সামনে রেখে সুবিধাজনক অবস্থান নিতে পারবে বিএসএফ। সে তুলনায় বাংলাশের সীমান্তে কোনো রকমের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। সীমান্ত এলাকার লোকজন জানান, বিডিআর হেঁটে একদিকে টহলে গেলে অন্যদিক নিরাপত্তহীন হয়ে পড়ে। চোরাচালানির খবর পেলেও বিডিআর হেঁটে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। এছাড়া বিএসএফ মাঝেমধ্যেই নোম্যান্স ল্যান্ডে প্রবেশ করে সীমান্ত এলাকার মানুষের গরু-ছাগল নিয়ে যায়। বিডিআর খবর পেয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে তারা চলে যায়। অথচ কোনো কোনো জায়গায় বিডিআরের একটি বিওপির বিপরীতে বিএসএফের ৬ থেকে ৭টি পর্যন্ত বিওপি রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে ১০০ থেকে ২০০ গজ অন্তর উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। প্রতিটি টাওয়ারে ৩ থেকে ৪ জন করে বিএসএফ সার্বক্ষণিক স্ট্যান্ডিং

www.pathagar.com

ডিউটি পালন করে। রাতের বেলা পর্যবেক্ষণের জন্য টাওয়ারগুলো থেকে হাজার কিলো ওয়াটের আলো জ্বালানো হয় বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে।

উত্তরাঞ্চলের উল্লিখিত জেলাগুলোর সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন কোম্পানি সদরের কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলে জানার গেছে তারা জিপ অথবা পিকআপ পাবার কথা থাকলেও পাচ্ছেন না। কাগজ-কলমে কোম্পানি সদর স্টান্ডার্ড পিকআপ অথবা জিপ প্রাপ্য। কিন্তু ৫ জেলা মধ্যে শুধু তেঁতুলিয়া কোম্পানি সদরে একটি পুরাতন লক্কর বক্কর জিপ দেখা গেছে। অন্যান্য কোম্পানি সদরগুলোতে পুরনো মেডেলের ৮০ সিসির একটি মোটরসাইকেল ও কয়েকটি লক্কড় ঝক্কড় মার্কা বাইসাইকেল দেখা গেছে। কোম্পানি সদরের কমান্ডাররা জানান, মোটরসাইকেলগুলোতে একজনের বেশি চলাচল করা যায় না। অনেক সময় রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায়। পুরনো হওয়ার কারণে অনেক কোম্পানি সদরের মোটরসাইকেল মাসের অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। তা দিয়েই সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বিডিআরকে।

সীমিত লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে বিডিআরে একিট সীমান্ত পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প বা বিওপির সদস্যরা বিএসএফের একাধিক ক্যাম্পের মোকাবিলা করে থাকে। বিডিআরের একটি বিওপির তুলনায় দ্বিগুণের বেশি সৈন্য রয়েছে বিএসএফের প্রতিটি বিওপিতে। একটি বিওপি থেকে অপর একটি বিওপি পর্যন্ত ৭থেকে ১২ মাইল এলাকা সীমান্ত পাহারা দিতে হয় বিডিআরকে। তারা হেঁটে নিয়মিত টহল দিলেও ভারতের বিএসএফ গাড়ি হাঁকিয়ে সীমান্তে টহল দেয়।

দেশের উত্তরের সর্বশেষ সীমান্ত বাংলা বান্দা জিরো পয়েন্টের কাছে অবস্থিত বাংলাবান্দা বিওপির টহল এলাকা হচ্ছে ১০ মাইল। বিপরীতে ভারতের লালদাসপাড়া, ফুলবাড়ী ও নারায়ণজুতে একটি বিওপি রয়েছে। বিএসএফ-এর এই ৩ বিওপির মোকাবেলা করেন বিডিআর এর বাংলা বান্দা বিওপি বিএসএফের তিনটি বিওপির অধীনে রয়েছে ১০০ গজ অন্তর উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। প্রতিটি টাওয়ারে ৩ থেকে ৪ জন স্ট্যান্ডবাই ডিউটি পালন করছে। তেঁতুলিয়ার আরেকটি বিওপি হচ্ছে মাগুরমারী সীমান্ত ফাঁড়ি। এই ফাঁড়ির বিপরীতে বিএসএফের রয়েছে ভোলাহাট ও চাউলহাটি ফাঁড়ি। নীলফামারীর ডোমারে চিলহাটি সীমান্তে ডাঙ্গাপাড়া বিওপির বিপরীতে ভারতের খালপাড়া ও দেবীগঞ্জ বিওপি। এখানে ২০০ গজ অন্তর বিএসএফের উঁচু পর্যবেক্ষণ টাওয়ার রয়েছে। এই বিওপিটির সীমান্তে কোনো রকমের রাস্তা নেই। প্রায় ১০ মাইল সীমান্ত এলাকা পাহারার দায়িত্ব হচ্ছে এখানে কর্মরত ৩০ জন জওয়ানের। এই বিওপির একজন বলেন, একদিকে ডিউটিতে গেলে আরেক দিকে খবর থাকে না। সীমান্ত এলাকায় কিছু ঘটলে মোবাইলের কল্যাণে সাধারণ মানুষ দ্রুত জানতে পারলেও হেঁটে দ্রুত পৌঁছানো যায় না। লালমনিরহাটের সর্বশেষ অঞ্চল হচ্ছে পাটগ্রামের দহগ্রাম ছিটমহল। সবচেয়ে বড় এ ছিটমহল পাহারার জন্য বিডিআরের ৩টি ক্যাম্প অবস্থিত। বিপরীতে বিএসএফের রয়েছে ১৮টি ক্যাম্প। পাটগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দর এলাকায় বুড়িমারী কোম্পানি সদর। এই

www.pathagar.com

কোম্পানি সদরেও রয়েছে ৮০ সিসির পুরনো একটি মোটরসাইকেল ও কয়েকটি লক্কড় ঝক্কড় মার্কা বাইসাইকেল। বিপরীতে বিএসএফের রয়েছে ৩টি কোম্পানি সদর। গত একমাসে বিএসএফের গুলিতে এ এলাকায় ৪ বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছে। লালমনিরহাটের আরেক সীমান্ত উপজেলা হাতিবান্দা। এ উপজেলার শিংমারী সীমান্তে অমীমাংসিত এলাকায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কাঁটাতারের বেড়া দিতে চাইলে বছরের পর বছর ধরে বিরোধ লেগে আছে। এ এলাকায় বছরে একাধিকবার বিএএফ ও বিডিআরের মধ্যে গোলাগুলি হয় বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। সীমান্ত নিয়ে বিরোধ থাকায় পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন আতঙ্কে দিন কাটায়।

লালমনিরহাটের সদর উপজেলার মোগলহাট সীমান্তে অবস্থিত বিডিআরের কোম্পানি সদরের বিপরীতেও রয়েছে ভারতের বিএসএফের গিতালদহ, মদনাগড়া ও পঞ্চদজি কোম্পানি সদর। মোগলহাটের পরিত্যক্ত রেলস্টেশনের শেষ মাথায় ৮২৯নং সীমান্ত পিলার। এখানে ধরলা নদী বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্ত করেছে। এই কোম্পানি সদরের এক জওয়ান জানান তাদের কোম্পানির জন্য দেয়া মোটরসাইকেলটিরও করুণ দশা। মাঝেমধ্যে উঁচু রাস্তায় উঠতে হলে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কাতে হয়। লালমনিরহাটের আরেক সীমান্ত উপজেলা আদিতমারি। এ উপজেলার সীমান্ত এলাকার দুর্গাপুর বিওপির সীমান্ত হচ্ছে ৮ মাইল। টহল দিতে শুধু কাঁচা রাস্তাই নয়–খাল-বিলও পার হতে হয়। দুর্গাপুর বিওপির একজন জওয়ান জানান তাদের বিপরীতে রয়েছে ভারতের শিঙ্গিমারী, বার্তার, মদনাকুড়া ও পঞ্চদজি বিওপি। প্রতিটি বিওপিতে বিএসএফের ৫০ জনের বেশি সৈনিক রয়েছে। তাদের রাস্তায় টহলের জন্য রয়েছে গাড়ি, নদী পারাপারে জন্য স্পিডবোটসহ প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট। তিনি জানান, বিডিআর সস্যদের খাল পার হতে হলে গ্রামের মানুষকে নৌকার জন্য অনুরোধ জানাতে হয়। কুড়িগ্রামের রৌমারীতে বরাইবাড়ী বিওপি থেকে বের হয়ে সীমান্ত টহল দিতে ৫টি ছোট-বড় খাল অতিক্রম করতে হয়। বিডিআরের নিজস্ব নৌকা না থাকায় এসব খাল পার হওয়ার সময় গ্রামের মানুষের নৌকার অপেক্ষায় থাকতে হয়। এসব সীমান্তে সরেজমিন দেখা গেছে, বিডিআর সদস্যরা মাইলের পর মাইল কাদা-পানিতে হেঁটে সীমান্ত টহল দিচ্ছেন। তাদের বিপরীতে পাশেই রিংরোড দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে সীমান্তে টহল দিচ্ছে বিএসএফ। ভারতের বিএসএফ-এর গাড়ি হাকিয়ে পর্যবেক্ষণের দৃশ্য দেখিয়ে বিভিন্ন বিওপির জওয়ানরা বলেন, আল্লাহ আমাদের দুটি পা দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত, বিডিআরের পা ও গ্রামের মানুষের ভালোবাসা এবং সহযোগিতাই হচ্ছে সীমান্ত রক্ষায় মূল প্রেরণা। তেঁতুলিয়ার মাগুরমারী বিওপির একজন জওয়ান ভারতের বিএসএফের পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, বিডিআরের এ ক্যাম্পের বিপরীতে বিএসএফের ৩টি ক্যাম্প রয়েছে। তারপরও এই পর্যবেক্ষণ টাওয়ারগুলোর সার্বক্ষণিক ৩ থেকে ৪ জন করে স্ট্যান্ডবাই ডিউটি করছে। তিনি আরও বলেন, তাদের হাঁটতে হয় না। একটি ফাঁকা গুলি ফুটলেও মুহূর্তের মধ্যে

www.pathagar.com

বিএসএফের কয়েকটি গাড়ি এসে পৌঁছে যায়। আর সীমান্তে কোনো ঘটনা ঘটলে বিডিআরকে মাইলের পর মাইল পায়ের ওপর ভর করে সেখানে পৌঁছতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় বিএসএফ ঘটনা ঘটিয়ে বিডিআর পৌঁছানোর আগেই নির্বিঘ্নে চলে যায়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, বিডিআরের এই কষ্ট কেউ দেখে না, কষ্টের কথা কেউ শুনতেও চায় না। তেঁতুলিয়া বাংলা বান্দা বিওপির এক জওয়ান টহলে কষ্টের বর্ণনা দিয়ে বলেন, বিডিআর নিজের ঘরে পরবাসী। নিজেরা গায়ে খেটে কাজ করি, কর্তৃত্ব করেন অন্যরা।

চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য হিলি সীমান্ত

সীমান্তে দুর্বল পাহারা। বিডিআর একদিকে গেলে আরেক দিক ফাঁকা থাকে : চোরাচালানের পণ্যের সঙ্গে ঢুকছে ভারতীয় অস্ত্র : বিএসএফও সহযোগিতা করছে

দুর্বল পাহারায় দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে চোরাচালান চলে প্রকাশ্যে। দিনদুপুরে সবার সামনে দিয়েই চোরাচালান চলে। চোরাচালানী নারী ও শিশুরা প্রকাশ্যে আসা-যাওয়া করে এসব নারী ও শিশুরা ভারত থেকে অবৈধ পণ্য হয়ে আসে। অবৈধ পথে আসা ভারতীয় বাইসাইকেলের হাটও বসে হিলিতে। বিডিআরের সামনে দিয়েই ভারতীয় পণ্যে ভর্তি ব্যাগের বোঝা মাথায় নিয়ে শিশু এবং নারীদের সীমান্ত পার হতে দেখা যায়। ভারতীয় ফেনসিডিল, মোটাতাজা হওয়ার ট্যাবলেট, শাড়ি, নিম্ন মানের পটাশ সার, চিনি ও জিরা হিলি সীমান্ত দিয়ে একরকম অবাধেই দেশের ভেতর প্রবেশ করে। এছাড়া হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভারতীয় অস্ত্রও আসছে। গত দুই মাসে হিলিতে ৪টি অবৈধ অস্ত্র ধরাও পড়েছে। চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা এখান থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় চোরাচালানকৃত পণ্য নিয়ে যায়। বিডিআর সদস্যরা জানান, তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে চোরাচালান ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। পায়ে হেঁটে সীমান্ত পাহারা দেয়ার সময় একদিকে তারা চলে গেলে অন্যপ্রান্ত মাইলের পর মাইল ফাঁকা থাকে। এতে বিএসএফের সহযোগিতয় চোরাচালানিরা নির্বিঘ্নে ভারতীয় পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। খবর পেয়ে বিডিআর সদস্যরা পায়ে হেঁটে জায়গা মতো পৌঁছানোর আগেই চোরানালানিরা গাড়িতে করে পণ্য নিয়ে চলে যায়। সীমান্ত পার হওয়ার সময় চোরাচালানিদের আটক করা কোনো অবস্থায়ই সম্ভব হয় না বলে জানান বিডিআর সদস্যরা। সীমান্ত পার করা কোনো পণ্যের বিষয়ে সোর্সের মাধ্যমে খবর পাওয়ার পর হানা দিয়ে বিডিআর সদস্যরা যা আটক করতে পারে তাই তাদের সাফল্য। হিলি রেলস্টেশনের পাশে বিডিআরের চেকপোস্ট কোম্পানির এক কর্মকর্তা জানান, গত ৫ মাসে শুধু এই চেকপোস্টে দায়িত্বপালকারী বিডিআর সদস্যরা সাড়ে ৫ কোটি টাকার ভারতীয় অবৈধ পণ্য আটক করেছে।

www.pathagar.com

এর মধ্যে জুলাই মাসের ২৭ দিনে আটক করেছে ৮৫ লাখ টাকার চোরাই পণ্য। ওই কর্মকর্তা আরো জানান, চোরাচালানের মাধ্যমে ভারত থেকে আসা পণ্যের সামান্যই তারা আটক করতে পারেন। বড় অংশই চলে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। আটক করা চোরাই পণ্যের মধ্যে রয়েছে পৌণে দুই কোটি টাকা মূল্যের ফেনসিডিল। এছাড়া রয়েছে শাড়ি, সার, জিরা ও মোটাতাজা হওয়ার ট্যাবলেট। এই পণ্যগুলো সরাসরি আটকের ঘটনা কম। বিভিন্ন স্থানে সোর্সের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে বিডিআর পৌঁছে এসব আটক করে। এত পণ্য কীভাবে আসে জানতে চাইলে তিনি আমার দেশকে বলেন, বিডিআর একদিকে টহলে গেলে অন্যদিকে ফাঁকা থাকে। দশ মাইলের বেশি এলাকা পাহারা দিতে হয় একটি বিওপির সদস্যদের। তিনি আরও জানান, একটি বিওপিতে ২০ থেকে ৩০ জনের মতো সৈনিক থাকে। এতো কম সৈনিক দিয়ে ৮ থেকে ১০ মাইল পায়ে হেঁটে পাহারা দিয়ে চোরাচালানকৃত সকল পণ্য আটক করা কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। এ জন্যই বিডিআরকে দেশের ভেতরে অবৈধ পণ্য আটক করতে সোর্সের ওপর নির্ভর করতে হয়।

চোরাচালানির বিষয়ে একই রকম মন্তব্য করেন হিলি এলাকায় অবস্থিত আরও ৩টি বিওপি এবং দুটি কোম্পানির সৈনিকরা। তারাও জানান, বিডিআররের জনবল ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট না থাকায় সীমান্ত পার হওয়ার সময় আটক করা সম্ভব হয় না। তারা জানান, বিডিআর একদিকে টহলে গেলে আরেকদিকে ফাঁকা থাকে। এই ফাঁকে দেশে প্রবেশ করে চোরাচালানকৃত পণ্য।

হিলির একপাশে বাসুদেবপুর কোম্পানি সদর। এই কোম্পানি সদর জুলাই মাসে ৫৫ লাখ টাকার ভারতীয় চোরাই পণ্য আটক করেছে বলে দাবি করেন এখানকার এক কর্মকর্তা। তিনিও জানান, চোরাইপথে যা প্রবেশ করে তার সামান্য একটি অংশ বিডিআর আটক করতে পারে। বড় অংশই চলে যায় দেশের ভেতরে। হিলির অপর পাশে আটপাড়া বিওপি। এই বিওপিতেও এক মাসে ২০ লাখ টাকার বেশি চোরাই পণ্য আটক করা হয়।

হিলির পার্শ্ববর্তী উপজেলা বিরামপুর ডিগ্রি কলেজে অবস্থিত বিডিআর ক্যাম্পের এক কর্মকর্তা জানান, জুন মাসের শুরু থেকে এক মাস ২৮ দিনে তারা প্রায় আড়াই কোটি টাকার চোরাই পণ্য আটক করেছেন। বিডিআরের মনোবল বৃদ্ধির জন্য গত জুন মাসের শুরুতে এই ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয় বলে জানান ওই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, যে পরিমাণ পণ্য আসে তার একশ ভাগের এক ভাগও আটক করা সম্ভব হয় না। তারা বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে অভিযান চালিয়ে এই পণ্য আটক করছেন। সীমান্ত দিয়ে কত পণ্য প্রবেশ করে তার কোনো হিসাব নেই বলেও জানান ক্যাম্পের বিডিআর জওয়ানরা।

দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার হিলি স্টেশনের দেয়াল ঘেঁষেই ভারত সীমান্ত। রেলস্টেশনের পাশেই রয়েছে হিলি স্থলবন্দর। এই স্থলবন্দর দিয়েও বৈধ পণ্যের পাশাপাশি অবৈধ পণ্য দেশে প্রবেশ করেছে। হিলি স্টেশন থেকে পার্বতীপুরের দিকে রেললাইন ঘেঁষে মাইলের পর মাইল ভারতীয় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। স্টেশনের দেয়াল ঘেঁষে সীমান্তের ওপারে রয়েছে ভারতীয়

www.pathagar.com

বাড়িঘর। এই বাড়িঘরগুলো চোরাচালানির ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এসব বাড়িতে পণ্য এনে নিরাপদে জমা করে। এই বাড়িগুলোর দেয়াল পার হলেই হিলির রেললাইন। রেললাইন পার করতে পারলেই রয়েছে বাংলাদেশি বাড়িঘর। দুই সীমান্তের এই বাড়িগুলোর পণ্য পারাপারকারীদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি। ব্যাগ ও বস্তা মাথায় করে চোরাচালানকৃত পণ্য সীমান্ত পার করে তারা। চোরাচালানকৃত পণ্য বহনকারী এসব নারী-শিশু কোনো রকমে রেললাইন পার হয়েই বাংলাদেশি বাড়িঘরগুলোতে প্রবেশ করে। এখানে কোনো দিনরাত নেই। সব সময় রেললাইন ক্রস করে সীমান্তের ওপার থেকে পণ্য নিয়ে নানা বয়সী নারী পুরুষকে এপারে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

হিলির সীমান্ত এলাকায় মানুষের কাছে দিনেদুপুরে চোরাচালানির সঙ্গে জড়িত নারী-শিশুরা এখানে পোটলাপার্টি হিসেবে পরিচিত। ছোট ছোট ব্যাগ বহন করে তারা দিনে কয়েক দফায় সীমান্তের এপার-ওপার যাতায়াত করে। এতে একজন নারী বা শিশু দিনে গড়ে এক মণের বেশি সার বা চিনি আনতে পারে। ফাতেমা নামে ১২ বছরের এক শিশু জানায়, সীমান্তের ওপার থেকে এনে তারা মহাজনের কাছে বিক্রি করে। এক মণ চিনি আনতে পারলে দুই থেকে আড়াইশ' টাকা লাভ হয়। এর জন্য তাকে ৩ থেকে ৪ বার করে প্রতিদিন সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। মাঝেমধ্যে দিনে ৭ থেকে ৮ বারও সীমান্ত পারাপার হয় বলে জানায় ফাতেমা। এ রকম প্রত্যেকেই দিনে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে। হিলি চেকপোস্ট বিডিআরের ক্যাম্পের বাইরে বসে কথা বলার সময় দেখা যায়, কয়েকজন নারী, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ব্যাগ মাথায় নিয়ে সীমান্ত পার হচ্ছে। তারা নিতান্তই পেটের জ্বালায় এসব করছে। কত টাকাই বা পায়। এছাড়া তারা কোনো না কোনো এনজিওর কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ। তাদের ধরেও কোনো লাভ হয় না। কোনো ভদ্রঘরের মহিলা ও শিশুকে এই কাজে ব্যবহার করা যাবে? জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় না পেয়েই তারা এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।' কেন তাদের প্রতিরোধ বা আটকাচ্ছেন না-জানতে চাইলে ওই কর্মকর্তা আমার দেশকে বলেন, তাদের ধরে এনে কোনো লাভ হয় না। প্রায় সময়ই লাঠিপেটা করে মালামাল রেখে দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, এরা এপারে বিডিআরের লাঠিপেটা খায়, ওপারে গেলে বিএসএফ দাবড়ে দেয়। তারপরও আবার যায়। তিনি এও বলেন ওই লোকগুলো এতই অসহায় যে তাদের কোর্টে চালান দিতেও বিবেকে বাঁধে।

হিলির বিভিন্ন ক্যাম্পের বিডিআর সদস্যরা জানান, এই এলাকায় অবস্থিত বিডিআরের বিওপিগুলোকে ৬ থেকে ৭ মাইল পর্যন্ত সীমান্ত পাহারা দিতে হয়। কিন্তু বিডিআর একদিকে গেলে অন্যদিকে চোরাচালানিরা মালামাল নিয়ে আসে। ৭ মাইল এলাকা পায়ে হেঁটে নিচ্ছিদ্র পাহারা দেয়া যায় না বলে জানান তারা।

হিলির পাশে বাসুদেবপুর কোম্পানি সদরের একজন কর্মকর্তা বলেন, একটি পুরনো ৮০ সিসি মোটরসাইকেল আছে, তা দিয়ে একজনের বেশি চলাচল করা যায় না। তাও আবার মাঝেমধ্যেই রাস্তায় বন্ধ হয়ে আটকে যায়। সোর্স

www.pathagar.com

চোরাালানির পণ্যের সন্ধান দিলেও দূরে যেতে হলে পাবলিক বাস বা অন্য পাবলিক গাড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়। ততক্ষণে চোরাচালানিরা পালিয়ে যাওয়া বা সরে পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। তিনি বলেন, প্রায় ১০ মাইল এলাকা দেখতে হয় কোম্পানি সদরে দায়িত্বপালনকারী ৩০-৩৫ বিডিআরকে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, পায়ে হেঁটে কি আর ১০ মাইল এলাকা পাহারা দিয়ে চোরাচালান ঠেকানো যায়? এটা কী কারও পক্ষে সম্ভব? তিনি জানান, তারপরও ২৮ দিনে ৫৫ লাভ টাকার পণ্য আটক করেছে এই কোম্পানির বিডিআর। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দায়িত্ব পালন করেও এতো পণ্য আটকের ঘটনাকে তিনি বিডিআর এর পরিশ্রম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেণ ওই কর্মকর্তা বলেন কিভাবে দায়িত্ব পালন করছে–এটা তো কেউ একবারও দেখে না।

বাসুদেবপুর কোম্পানির কাছেই হাঁড়িপুকুর গ্রাম। এই গ্রামকে দুই ভাগ করেছে সীমান্ত। উভয় দেশের সীমান্তের জিরো পয়েন্টে নো ম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থিত গ্রামটি। বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত একটি মসজিদে দুই দেশের মানুষ নামাজ আদায় করে। এই গ্রামটিও চোরাচালানির ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহাত করা হয়। বিডিআর জওয়ানরা জানান, এই গ্রামটি নো ম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থান করতে চাইলেই চোরাচালানিরা ভারতের অংশে প্রবেশ করতে পারে। তখন আর কিছুই করার থাকে না। আবার ভারতের বিএসএফ কখনও অভিযান চালাতে এলে বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করে। এতে তাকে সহজে ধরা যায় না। এই গ্রাম হয়ে চোরাচালানকৃত পণ্যের বড় একটি অংশ দেশের ভেতরে প্রবেশ করে।

হিলি এলাকায় বিডিআর সদস্য এবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিলেও ১০০ গজ অন্তর গেট রেখেছে। চোরাচালানিদের সঙ্গে বিএসএফ ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশে সহযোগিতা করে। ফাঁক বুঝে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার গেটের তালা খুলে দেয়।

তিনস্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী ভারতের কাঁটাতারের বেড়ায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশ

সীমান্তজুড়ে ভারতের কাঁটাতারের বেড়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। কাঁটাতারের বেড়ায় পাশাপাশি পাকা রিংরোড, উঁচু টাওয়ারে ফ্লাডলাইটসহ তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেছে ভারত। দুই লাইনে তৈরি কাঁটাতারের বেড়ায় ১০০ গজ অন্তর রয়েছে গেট। তালাবদ্ধা করে রাখা এ গেটগুলো বি এস এফ তাদের প্রযোজনে খেয়াল খুশিমত খুলে দেয়। কোনো কোনো সীমান্তে আন্তর্জাতিক সীমানা আইন লঙ্ঘন করে

www.pathagar.com

বিরোধপূর্ণ জায়গায় বাংলাদেশের আপত্তি উপেক্ষা করে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করছে ভারত। গত ২৯ ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের পরের দিন লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা উপজেলায় শিংগীমাড়ি সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী বিরোধপূর্ণ স্থানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের প্রস্তুতি নিলে বিডিআর ও স্থানীয় লোকরা বাধা দেয়। তারপরও রাতের আঁধারে কিছু অংশে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করেছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় গ্রামবাসী।

ভারতের তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিপরীতে বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষায় রয়েছে দুর্বল ব্যবস্থাপনা। উত্তরাঞ্চলের ৬ জেলার বিভিন্ন সীমান্তে বিডিআরের বিওপিগুলোতে কর্মরত সৈনিকরা জানান, এ পর্যন্ত কোনো সীমান্তে সংঘর্ষে ভারতীয় বিএসএফ বিডিআরকে পরাজিত করতে পারেনি। তবে রণকৌশলের দিক থেকে তারা অনেক এগিয়ে গেছে। নিরাপত্তা কৌশলের দিক থেকে ভারত শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। বিপরীতে বাংলাদেশের সীমান্তে বিডিআরের সীমিত নজরদারি ছাড়া অন্য কোনো নিরাপত্তা কৌশল নেই। বিডিআর জওয়ানরা জানান, রণকৌশলের দিক থেকে সীমান্তের রিং রোড হচ্ছে বিএসএফের প্রতিরক্ষাব্যূহ। কোনো কারণে সীমান্তে উত্তজনা দেখা দিলে বিএসএফ রিংরোডের পাশে নিরাপদ অবস্থান নিতে পারবে। এছাড়া রিংরোডের পাশেই কোনো কোনো স্থানে বিএসএফ পাকা ব্যাংকারও তৈরি করেছে। বিডিআর জওয়ানরা আরো জানান, রণকৌশলের দিক থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রতিবেশী দেশ কোনো এলাকায় আক্রমণ করে ঢুকে পড়লে পাল্টা কৌশল হিসাবে সেই রাষ্ট্রের একটি অংশ দখলে নেয়া। কিন্তু ভারত এখন বাংলাদেশের কোন অংশে ঢুকে পড়লে কাঁটাতারের বেড়ার কারণে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ভারতের কোনো জায়গা দখলের সুযোগ নেই। কাঁটাতারের বেড়া হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রথম লাইন। দ্বিতীয় লাইন হচ্ছে রিংরোড এবং তৃতীয় লাইন হচ্ছে বিএসএফ। বিএসএফ এখন ইসরাইলের তৈরি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বাংলাদেশ-ভারতের ৪ হাজার ১৪৬ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে নদী সংশ্লিষ্ট ১৮০ কিলোমিটার সীমান্ত ছাড়া ৩ হাজার ২০০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। ইতোমধ্যে দুই হাজার ৩০০ কিলোমিটারের বেশি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করেছে তারা। বাকি কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের আপত্তি সত্ত্বেও ভারতের মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ৩০৭ কিলোমিটার বিরোধপূর্ণ সীমান্তেও ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে ৮০টি পয়েন্টে ১৩৪ কিলোমিটার, মেঘালয় সীমান্তে ৭৮টি পয়েন্টে ৩৮ কিলোমিটার এবং ত্রিপুরার সীমান্তে ১০৭টি পয়েন্টে ১২৭ কিলোমিটার বিরোপূর্ণ জায়গায় আন্তর্জাতিক সীমানা আইন লঙ্ঘন করে ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশের তিন দিকে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ২ হাজার ২১৬ দশমিক ৭ কিলোমিটার, আসামের সঙ্গে ২৬৩ কিলোমিটার,

www.pathagar.com

মেঘালয়ের সঙ্গে ৪৪৩ কিলোমিটার, ত্রিপুরার সঙ্গে ৮৫৬ কিলোমিটার এবং মিজোরামের সঙ্গে রয়েছে ৩১৮ কিলোমিটার সীমান্ত। ভারত তাদের ভাষায় সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ভারতীয় বিএসএফ সীমান্তে কারফিউ জারি করে। কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে জিরো লাইনের পাশে দেখলেই গুলি করে বিএসএফ।

প্রতিনিয়তই বিএসএফের গুলিতে সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হচ্ছে। গত শুক্রবারও পাটগ্রামের বুড়িমারি সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে একজন বাংলাদেশি নিহত হয়। এর আগে গত জুলাই মাসে কুড়িগ্রামের রাজিবপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই সহোদর নিহত হয়। বিএসএফের অত্যাচারে সীমান্ত এলাকার মানুষ ভয়ে রাতে ঘর থেকে বের হয় না। সীমান্তে ভারতীয় বার্ষিক কারফিউর কারণে জিরো লাইনের পাশে অবস্থিত গ্রামগুলোর বাসিন্দারা সন্ধ্যার পর আর ঘর থেকে বের হতে পারে না। সন্ধ্যার আগেই তাদের ঘরে ফিরতে হয়।

বিডিআর জওয়ান ও সীমান্ত এলাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কাঁটাতারের বেড়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারলেও ভারত থেকে অবাধে আসছে। বিএসএফ তাদের সুবিধামতো কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে দেয়। বিডিআর জওয়ানরা বলেন, চোরাচালন দমনই যদি কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এতো অবৈধ পণ্য ভারত থেকে এ দেশে ঢুকতে পারত না। রাতের বেলায় যেসব চোরাচালন পণ্য দেশে প্রবেশ করে সবই বিএসএফের সহযোগিতায় আসে বলে অভিযোগ করেন বিডিআর জওয়ানরা।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, দিনাজপুরের হিলি, বিরামপুর, নীলফামারির ডোমারে ছিলিহাট, লালম-নিরহাটের পাটগ্রাম, হাতি বান্ধা, আদিতমারি, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী, রৌমারী, ভুরুঙ্গামারী, রাজিবপুরসহ উল্টরাঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্তের জিরো লাইনের কাছে গিয়ে দেখা গেছে, কাঁটাতারের বাইরে দেড়শ' গজের মধ্যে নো-ম্যান্সল্যান্ডে ভারতীয় নাগরিকরা তাদের জমিতে চাষাবাদ করছে। তেঁুলিয়ায় সীমান্ত পিলার ঘেঁষে নো-ম্যান্সল্যান্ডের ভারতীয় অংশে চা বাগান লাগানো হয়েছে। স্থানীয় কৃষক জানান, বিএসএফ সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তাদের কৃষকদের জন্য কাঁটাতারের বেড়ার গেট খোলা রাখে। এসময় ভারতীয় গ্রামের কৃষক ও শ্রমিকরা গেট পার হয়ে নো-ম্যান্সল্যান্ডে অবস্থিত তাদের জমিতে এসে চষাবাদ করে।

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলার মাঝিপাড়া সীমান্তের ময়নাকুড়ি গ্রামের লোকজন জানান, বিএসএফ প্রায়ই জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। গত বছর ১৬ নভেম্বর রাতে বিএসএফ এই গ্রামে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে এক মহিলা ও ৮ মাসের শিশুসহ ৩ ব্যক্তি নিহত হন। সেদিন বিএসএফের গুলিতে আরো ৮ জন আহত হন। তারা জানান, বিডিআর ক্যাম্পে

www.pathagar.com

এই সংবাদ পৌঁছার পর সঙ্গে সঙ্গে বিডিআর প্রতিরোধের জন্য রওয়ানা দেয়া। কিন্তু পায়ে হেঁটে বিডিআর আসতে আসতেই বিএসএফ নির্বিঘ্নে চলে যায়। বিডিআর এর যানবাহন না থাকায় এ রকম ঘটনা প্রায় ঘটে বলে জানায় সীমান্ত গ্রামের মানুষ। কোনো কোনো জায়গায় রাতের বেলা কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুতের সংযোগও দেয়া হয়।

লালমনিরহাটের পাটগ্রামের বুড়িমারী সীমান্তে আওলিয়ার হাট, মংলিবাড়ি ও আমবাড়ি গ্রামের মানুষ জানান, বিএসএফ সীমান্ত অতিক্রম করে যখন-তখন তাদের গ্রামে ঢুকে পড়ে। বিএসএফ-এর গুলিতে এই এলাকায় ৮৩৯ নং সীমান্ত পিলার থেকে ৮৪৩নং সীমান্ত পিলার পর্যন্ত সীমানার মধ্যে এক মাসের মাথায় ৩ জন নিহত হয়েছে। মংলিবাড়ি গ্রামে বিএসএফের গুলিতে নিহত সেলিম মিয়ার মা মর্জিনা বেগম এখন পুত্রশোকে পাথর। তিনি জানান, আয়-রোজগারের মতো কেউ না থাকায় এখন তাকে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়।

এদিকে কাঁটাতারের বেড়াঘেষে সীমান্তজুড়ে রিংরোডও তৈরি করা হচ্ছে। রিংরোড তৈরির কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। মূল ভূখণ্ডে ৬ থেকে ৭ ফুট উঁচু করে তৈরি হচ্ছে এই রিংরোড। রোডের পাশে বিভিন্ন জায়গায় বিএসএফ পাকা ব্যাংকার তৈরি করছে। এর বিপরীতে বাংলাদেশের সীমান্ত পাহারায় কর্মরত বিডিআরের পায়ে হাঁটার জন্যও কোনো রাস্তা এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি। বিভিন্ন বিওপিতে নিয়োজিত বিডিআর সদস্যরা জানান, রাতের বেলায় সীমান্ত পর্যবেক্ষণের জন্য টহলের সময় তাদের বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। তারা জানান, ভারতের শক্তিশালী নিরাপত্তা বেষ্টনীর বিপরীতে সীমান্তে টহলের জন্য বাংলাদেশের অন্তত কাঁচা রাস্তা হলেও তৈরি করা উচিত।

ছিটের মানুষ নিজভূমে পরবাসী

ভারতীয় ছিটমহলে অবাধে চলছে গাঁজার চাষ : ভারতীয় ছিটমহলের মানুষ বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে যেতে চায় : অবরুদ্ধ বাংলাদেশীরা নূন্যতম সুবিধাও পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় ছিটমহলগুলোর অধিবাসীরা সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু ভারতের ভেতরে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটমহলের বাসিন্দারা ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাও পান না। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সংলগ্ন ভারতের কুচবিহারে অবস্থিত সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি ছিটমহল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় যাতায়াতের সীমিত সুযোগ রয়েছে। বাকি ৫১টি ছিটমহলের মানুষ ভারতীয় বিএসএফের হাতে অবরুদ্ধ। অথচ বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থিত ভারতের ১১১টি ছিটমহলের মানুষ অবাধে সে দেশে যাতায়াত

www.pathagar.com

করতে পারছে। রালমনিরহাটের পাটগ্রাম, কুড়িগামের ভুরুঙ্গামারী, ফুরবাড়ী ও রৌমারী উপজেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত ছিটমহলগুলো সরেজমিন ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে।

সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলায় ২টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারত কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে নিয়ে গেছে। ভারতের কুচবিহার জেলার দিলহাটা থানার অন্তর্গত বাংলাদেশি ছিটমহল শিব প্রসাদ মোস্তাফি, ছিট করলা-১ কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। বাংলাদেশি নাগরিক হলেও কাঁটাতার অতিক্রম করে মূল ভূ-খণ্ডে আসতে পারেন। এখানকার বাংলাদেশিরা ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়া ও বিএসএফের হাতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দুই ছিটমহলের প্রায় ৭ হাজার মানুষ নাগরিকত্বহীন। তারা ভোটাধিকারও পায়নি। বাংলাদেশের নাগরিক হলেও তারা নিজ দেশের সঙ্গে সরাসরি কোনো যোগাযোগ করতে পারছে না। সুযোগ-সুবিধানিহীন অবস্থায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করে। চাইলেই নিজের দেশের ভেতরে আসতে পারে না। তাদের সন্তানরা লেখাপড়ার সুযোগও পাচ্ছে না।

অপরদিকে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী থানায় একই এলাকায় দাসিয়ার ছড়ায় অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীরা বাংলাদেশের ভেতরে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। এমনকি তারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে হজ্বে যাওয়াসহ চাকরি করতেও বিদেশে যাচ্ছেন। ফুলবাড়ী থানার সদর ইউনিয়নের দাসিয়ার ছড়ায় অবস্থিত এই ভারতীয় ছিটমহলে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ছিটমহলটি হেরোইন, ফেনসিডিল, গাঁজাসহ অবৈধ পণ্য পাচারের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ছিটমহলটি বাংলাদেশি ভূখণ্ডের ভেতরে হলেও আন্তর্জাতিক সীমানা আইনের কারণে বিডিআর এখানে প্রবেশ করতে পারে না। বাংলাদেশের ভূখণ্ড অতিক্রম করে আসতে হলে ভারতীয় বিএসএফকেও আন্ত র্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করতে হয়। এজন্য বিএসএফও এখানে আসে না বিডিআরও যেতে পারে না। এই ছিটমহলটিতে গিয়ে দেখা যায় ৩ শতাধিক বাড়ির আঙিণায় অবাধে গাঁজা চাষ হচ্ছে। এসব গাঁজা বাংলাদেশের ভেতরে বিক্রি করা হয়।

এখানে ১০৪০টি পরিবারে ৭ হাজার লোক বসবাস করেন। ছিটমহলটিতে জমির পরিমাণ ১ হাজার ৯০০ একর। ভারতীয় এই ছিটমহলের ভেতরেও বাংলাদেশি একটি ছিট মহল রয়েছে। ছিটের ভেতরে চন্দ্রকোণা নামে এই ছিটমহলটিতে ৬০ পরিবারে বাংলাদেশি ২৫০ জন মানুষ বসবাস করেন। তারাও নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত।

www.pathagar.com

দাসিয়ার ছড়া ভারতীয় ছিটমহলে ১১টি মসজিদভিত্তিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার রয়েছে। প্রতিটি মসজিদ কমিটি থেকে একজন করে তত্ত্বধায়ক সরকারের সদস্য। তারা আবার একজন সরকার প্রধান নির্বাচন করেন। বর্তমানে তত্ত্বাবধায়খক সরকারের প্রধান হলেন আলী আহমদ। গত ৩ আগস্ট ছিটমহলের বাজারে আলী আহমদের সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমার দেশকে জানান, তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখানে ৫ বছর অন্তর একটি সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। নির্বাচনের মাধ্যমে ছিটমহলে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হয়। তবে কোনো নারী ভোটার নেই। পুরুষরাই শুধু ভোট দিতে পারেন। ভোটার তালিকা তারা নিজরাই তৈরি করেন। ভোটার সংখ্যা ১৯৭৭ জন। তবে বর্তমানে চেয়ারম্যান নেই। কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ২ বছর পার হয়ে গেলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়ারম্যান নির্বাচন দিচ্ছেন না। এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান আলী আহমদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সর্বশেষ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নানা রকমের দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এতে ছিটমহলবাসীকে নানা রকম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে। এজন্য নির্বাচন দেয়া হচ্ছে না।

আর কতদিন এভাবে চলবে জানবে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান আলী আহমদ আমার দেশকে বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে যেতে চাই।' কারণ, ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের গ্রামের স্কুলে পড়ালেখা করে। এমনকি কেউ কেউ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর বাংলাদেশের কোনো গ্রামের ঠিকানা ব্যবহার করে চাকরিও করছে। তিনি আরো জানান, তাদের এই ছিটমহলের কেউ হজ্বে যেতে চাইলে বা বিদেশে যেতে চাইলে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করে। পাশে বসা এক বৃদ্ধকে দেখিয়ে তিনি বলেন, উনি কয়েক বছর আগে বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে হজ্ব করে এসেছেন। আলী আহমদ আরো জানান, তাদের গ্রামের হাটে বাংলাদেশি পণ্য বেশি বেচাকেনা হয়। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের তেমন সুবিধা না থাকায় তারা বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করেন। এতে তাদের কেউ বাধা দেয় না। তিনি বলেন, যুগের পর যুগ এভাবে মানুষ চলতে পারে না। ছিটমহলগুলোর একটি সুষ্ঠু সমাধান হওয়া উচিত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে এই ছিটমহলের মানুষ এভাবেই বসবাস করে আসছেন। ভারতের নাগরিক হিসাবে তারা কোনো দিন ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারেনি, নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রও কেউ পায়নি। নামেই শুধু দাসিয়ারা ছাড়া ছিটমহলটির ভারতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন যে দেশের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছি সেই দেশের সঙ্গে আমরা মিশে যেতে চাই। জমিজমা কীভাবে বেচাকেনা হয় জানতে চাইলে আলী আহমদ জানান, জমিজমা বিক্রি করতে কোনো রেজিস্ট্রেশন হয় না। নিজেদের মধ্যে কাগজে চুক্তি করা হয়। সেই স্টাম্পটিও কেনা হয় বাংলাদেশ থেকে।

অপরদিকে ফুলবাড়ি থানার একই ইউনিয়নের সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিটকরলা-২। ছিটমহলে গিয়ে দেখা গেছে ৬টি পরিবারের ৫২ জন লোকের বসবাস এখানে। ছিটমহলটিতে জমির পরিমাণ ৭০ বিঘা।

www.pathagar.com

৯৩২নং সীমানা পিলার থেকে ভেতরে ভারতের অংশে নোম্যান্সল্যান্ডে মাত্র ৭০ গজ জায়গা অতিক্রম করতে পারলেই বাংলাদেশের মুল ভূখণ্ডে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু ভারতীয় বিএসএফের অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ। ছিটমহল থেকে ৭০ গজ ভারতীয় ভূমি অতিক্রম করে মুল ভূখণ্ডে আসতে চাইলেই বাধা দেয়া হয়। কারণে-অকারণে বিএসএফ ছিটমহলের লোকদের ধরে নিয়ে অত্যাচার করে। এই ছিটমহলের ৬ পরিবারের সর্দার বৃদ্ধ খোকা মিয়া বলেন, মাত্র ৭০ গজ রাস্তার জন্য ৬টি পরিবারে নিজ দেশের কোনো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। তিনি ৯৩২নং সীমানা পিলার দেখিয়ে বলেন, এই সীমানা পিলারের ভেতরে ভারতীয় নোম্যান্সল্যান্ডের ৭০ গজের মধ্যে মাত্র ৬ পরিবারের ছিটমহল। তিনি জানান, ভোট দেয়াসহ কোনো নাগরিক সুবিধা তাদের নেই। ছেলেমেয়েরাও নির্বিঘ্নে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে না। গত ৪ আগস্ট ৯৩২নং সীমানা পিলারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় খোকা মিয়া আমার দেশকে জানান, মাত্র ২০ দিন আগেও তার এক ছেলেকে ভারতীয় বিএসএফ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বিডিআরের সহযোগিতায় ফেরত এসেছে।

কুড়িগ্রামের একই উপজেলায় ছিট করলা-১ ও ছিট মোস্তফি ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে নিয়ে যাওয়ায় সেখানে কেউ যাতায়াত করতে পারে না। সীমান্তে বাংলাদেশি গ্রামের স্থানীয় অবিাসীরা জানান, কেউ ছিটমহলে অবস্থানকারী আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে প্রথমে বিডিআরের বিওপিতে যোগাযোগ করতে হয়। বিএসএফের সঙ্গে আলোচনা করে বিডিআর ছিটমহলে সীমিত সময়ের জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেয়। বিএসএফ-এর নির্ধারণ করা সময়ের মধ্যে ফেরত আসতে হয়। এছাড়া ছিটমহলে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ নেই।

কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ১৬টি ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ৯টি ছিটমহল রয়েছে। ভুরুঙ্গামারীর পাথরডুবি ইউনিয়নের ময়দান বিওপির কাছেই ভারতীয় দুটি ছিটমহল অবস্থিত। গাওচুলকা-১ ও গাওচুলকা-২ নামক ছিটমহলের পাশ দিয়েই ময়দান বিওপিতে যেতে হয়। অজপাড়াগাঁয়ের প্রায় ৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করে এ বিওপিতে পৌছাতে হয়। বিওপিতে যাওয়ার পথে ভারতীয় এ দুই ছিটমহলে গিয়ে দেখা যায় এখানকার নাগরিকরা বাংলাদেশের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। তাদের হাটবাজার থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা সবই হচ্ছে বাংলাদেশে। তাদের বছরে একদিনের জন্যও নিজ ভূখণ্ড ভারতের ভেতরে যেতে হয় না। এ কথা অকপটে বলেন এ দুই ছিটমহলের মানুষ। মানুষ। এখানে পরিবারের সংখ্যাও কম। দুই ছিট মিলে মাত্র ২০টি পরিবার বসবাস করছে।

অপরদিকে এ উপজেলার সীমান্তে ভারতের ভেতরে অবস্থিত বাংলাদেশের মশালডাঙ্গা ছিটমহলে যেতে চাইলেও সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। ছিটমহলের বাসিন্দা শুকুর মুন্সী ও আবদুল হাকিম কৌশলে আমার দেশ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানান, তাদের ছেলেমেয়েরা পড়ালেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের নেই কোনো রকমের নাগরিক অধিকার। ছিটমহল থেকে

www.pathagar.com

মূলভূখণ্ডে আসতে চাইলে বিএসএফের তাড়া খেতে হয়। তারা আরো জানান, ভারতীয় প্রাথমিকস্কুলে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় পড়ালেখা করার জন্য ভর্তি হতে পারলেও হাইস্কুলে ভর্তির সুযোগ পায় না। আবদুর হাকিম জানান, ১৯৮৫ সালে তারা ইউপি নির্বাচনে ভোট দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এছাড়া জীবনে আর কখনো ভোট দেয়ার সুযোগ মেলেনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১০টি ছোট ছোট ছিট মিলে মশালডাঙ্গা ছিটমহলের অবস্থান। ভুরুঙ্গামারী উপজেলার ২নং পাথরকুচি ইউনিয়নের সীমান্তে এই ছিটমহলগুলোর অবস্থান। এ ছাড়াও ৩নং তিরাই ইউনিয়নের সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে ছিটতিলাই, ৬নং জয়মনিহাট ইউনিয়নে সীমান্তে ভারতের ভেতরে পায়তুর কুটি, পশ্চিম-মধ্য পূর্ব বাকলির ছড়া নামে ছিটমহল রয়েছে। ভারতের ভেতরে বাংলাদেশের এসব ছিট মহলের মানুষও নির্বিঘ্নে মূল ভূ-খণ্ডে আসতে পারে না।

ভুরুঙ্গামারি উপজেলা সীমান্তে ভারতের অভ্যন্তরে এ সব বাংলাদেশি ছিটমহলে ২০০৮ দশমিক ৫৩ একর জমি রয়েছে। এ সব ছিটমহলে ৫০০ পরিবারে মোট ২০ হাজার লোক বসবাস করে। অপরকিে এই উপজেলায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবিস্থত ভারতীয় ৯টি ছিটমহলে ৫০০ পরিবারে লোকসংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। জমির পরিমাণ ৩০২ দশমিক ৮০ একর। এই লোকগুলো বাংলাদেশের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার ও ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়া-লেখার কোনো বাধ্য নেই।

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ছিটমহল হচ্ছে দহগ্রাম আঙ্গরপোতা। ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে ভারত তিন বিঘা করিডোর ব্যবহার করার সীমিত সুযোগ দেয়। এতে দহগ্রাম আঙ্গপোতার মানুষ সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত করিডোর ব্যবহার করে নিজ দেশের মূল ভূখণ্ডে আসতে পারে। এই ছিটমহলের অধিবাসীরা জানান, রাতে জরুরি প্রয়োজনে রোগী নিয়েও যাতায়াত করতে দেয় না বিএসএফ। সন্ধ্যা ৬টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে করিডোরের গেট বন্ধ করে দেয়া হয়।

এখনও বিচ্ছিন্ন বড়াইবাড়ী সীমান্ত ক্যাম্প

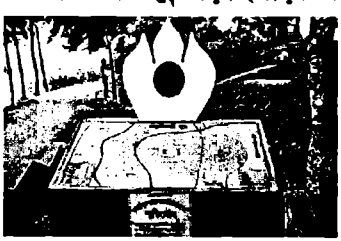

২০০১ সালে এখানেই রাতের আঁধারে আকস্মিক হামলা চালায় বিএসএফ ওই ভয়াবহ সংঘর্ষে শহীদ তিন বিডিআর সদস্যকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না দেয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নিজেদের তৈরি স্মৃতিসৌধে প্রতি বছর শ্রদ্ধা জানায়

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার দুর্গম বড়াইবাড়ী সীমান্ত এলাকার মানুষ এখনও আতঙ্কে দিন কাটায়। সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছন্ন রৌমারীর বড়াইবাড়ীসহ

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিডিআর কাম্প বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সন্ধ্যা নেমে এলে ভুতুড়ে অন্ধকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিএসএফের দখলদারি মনোভাবের কারণে উদ্বগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটায় এ সীমান্তের মানুষ। ২০০১ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের স্মৃতি বড়াইবাড়ীর মানুষ ভুলতে পারে না। এই যুদ্ধে বিজয়ের স্মৃতি মানুষের হৃদয়ে যেমন সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে। কারণ ২০০১ সালের তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন আরও খারাপ হয়েছে।

এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বরে জানা গেছে, ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে বিএসএফ এ এলাকায় প্রবেশ করে বিডিআর ক্যাম্প দখলের অপচেষ্টা চালিয়েছিল। বিডিআর ও স্থানীয় জনতা মিলে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলায় পরাজিত হয়েছিল বিএসএফ। এই যুদ্ধে বিডিআরের শহীদ ৩ সদস্যের বীরত্বের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সম্মান না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ বড়াইবাড়ীর মানুষ। স্থানীয় চেয়ারম্যানের উদ্যোগে এলাকার মানুষ নিজেরাই বিডিআর ক্যাম্পের পাশে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছে।

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দুর্গম এলাকা বড়াইবাড়ী। ইঞ্জিনের নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হতেই সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা। নদী পার হয়ে বড়াইবাড়ী বিডিআর ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে আরও ৫টি নদী, বিল ও খাল পার হতে হয়। যানবাহন নিয়ে বড়াইবাড়ী বিওপি পর্যন্ত পৌঁছার কোনো সুযোগ নেই। ডিঙি নৌকায় বিল, নদী, খাল পার হয়ে পৌঁছাতে হয় বিওপিতে। বড়াইবাড়ীতে সীমান্ত রক্ষায় বিওপিতে নিয়োজিত ৩০ জনের মতো বিডিআর সদস্যের মূল সাহস হচ্ছে এলাকার মানুষের অকৃত্রিম সহযোগিতা। বিডিআর জওয়ানদের মতে, বড়াইবাড়ী ও আশপাশের গ্রামের মানুষদের দেশপ্রেম না থাকলে বিডিআরের একার পক্ষে ২০০১ সালের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না।

বড়াইবাড়ী বিওপি এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, এখানে যানবাহন পৌঁছানোর কোনো সুযোগ না থাকলেও ওপাশে ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ গাড়ি হাঁকিয়ে টহল দিচ্ছে। অথচ বরাইবাড়ি ক্যাম্পের চার পাশে খাল। নেই কোনো রাস্তা। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ায় পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের মাধ্যমে বিএসএফ সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে। বড়াইবাড়ী গ্রামের পাশ দিয়েই ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। কাঁটাতারের পাশেই টহলের জন্য তৈরি পাকা রিংরোড দিয়ে বিএসএফের গাড়ি চলাচল করতে দেখা যায়। অপরদিকে বিডিআর ক্যাম্প থেকে বের হয়ে সীমান্তে টহলে যাওয়ার রাস্তা নেই। কাঁচা রাস্তা যা ছিল, তা মেরামত না হওয়ায় জিঞ্জিরা নদীর ঢলে ভেঙ্গে গেছে। রাস্তাটি এখন খালে পরিণত হয়েছে। এখন আর চাইলেও এ রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায় না। নৌকা দিয়ে রাস্তা পার হতে হয়। কাদামাটির ভাঙা নালা-নর্দমার এই রাস্তা দিয়েই বিডিআর নিয়মিত সীমান্তে টহল দিচ্ছে বলে জানান স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুহুল আমিন। তিনি জানান, ২০০১ সালে এখানে

www.pathagar.com

ভারতের সঙ্গে এতো বড় একটি যুদ্ধ হওয়ার পরও সরকার বিডিআর টহলের জন্য রাস্তার উন্নয়ন করেনি। তিনি জানান, বড়াইবাড়ী বিডিআর ক্যাম্প থেকে পশ্চিমে কর্তৃবাড়ী হাট পর্যন্ত রাস্তাটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপরও এ রাস্তাটি দিয়ে এখন পায়ে হেঁটেও নির্বিঘ্নে চলাচল করা যায় না। ভাঙনের কারণে নৌকায় পার হতে হয়। রৌমারী বা রাজীবপুর থেকে বড়াইবাড়ী বিডিআর ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছতে ক্যাম্পের পশ্চিম পাশে দরনি নদী, পথা দহপাড়া ঈদগাহ সংলগ্ন রাস্তার ভাঙন, বাউয়ের চর গ্রামের খাল, কলাবাড়ী বিল, জিঞ্জিরা নদী ও খাশিয়াবাড়ী গ্রামের পূর্ব রাস্তায় ভাঙনে নৌকা দিয়ে পার হতে হয়। জরুরি প্রয়োজনে বিডিআর ক্যাম্পে জরুরি সামরিক সাহায্য নিয়ে যেতে চাইলেও এগুলো অতিক্রম কতে হবে। ওই ক্যাম্পের বিডিআর জওয়ানরা জানান, জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্তে ভূখণ্ড রক্ষার জন্য অন্তত এ সব স্থানে বেইলি ব্রিজ দিয়ে হলেও সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করা উচিত।

বড়াইবাড়ীর স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রুহুল আমিন জানান, ২০০১ সালের যুদ্ধের পর বিডিআরের যতজন মহাপরিচালক হয়েছেন, সবাই এখানে এসেছেন। সরকারি অনেক কর্মকর্তাও এসেছিলেন। তারা সবাই অন্তত সীমান্ত সুরক্ষার জন্য হলেও রাস্তার উন্নয়ন এবং বিডিআর ক্যাম্প পর্যন্ত নির্বিঘ্নে যাতায়াতের লক্ষ্যে নদী ও খালগুলোতে বেইলি ব্রিজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

বড়াইবাড়ী যুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদাতবরণকারী ৩ বিডিআর সদস্য ল্যান্স নায়েক ওয়াহিদ, শহীদ সিপাহী মাহফুজুর রহমান ও শহীদ সিপাহী আবদুল কাদের স্মরণে বিডিআর ক্যাম্পের পাশেই একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিবছর ১৮ এপ্রিল এখানে বিডিআর ও স্থানীয় জনগণ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী এসব বীর সৈনিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এদিকে যুদ্ধের সময় ভারতীয় বাহিনীর বুলেটের আঘাতে বিডিআর ক্যাম্প ভবনের ক্ষতবিক্ষত দেয়াল এখনও মেরামত করা হয়নি। দেয়ালের শতাধিক জায়গা ক্ষত হয়ে আছে। কেন মেরামত করা হয়নি জানতে চাইলে একজন বিডিআর সদস্য বলেন, এই আঘাতের চিহ্নগুলো যতদিন থাকবে, ততদিন বিডিআরকে প্রতিপক্ষের প্রতি পাল্টা আঘাতের জন্য শক্তি যোগাবে। ভারতের বিরুদ্ধে একটি বিজয়ী যুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে দেয়ালের ক্ষতস্থানগুলো এভাবেই রেখে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এটাই বড় যুদ্ধ ছিল বলে উল্লেখ করেন বিডিআর। এই যুদ্ধে সাড়ে ৪শ বিএসএফ নিহত হয় বলে জানান তৎকালীন বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান।

www.pathagar.com

ভারতের কারসাজি নদীতে বিলীন হচ্ছে দহগ্রাম তেঁতুলিয়া

২ স্রোতের গতি সরিয়ে দেয়ায় ভাঙছে তিস্তা মহানন্দা : চর ওঠায় বাড়ছে ভারতে ভূমির পরিমাণ : তিস্তার ভাঙনে উদ্বিগ্ন দহগ্রামের ১৫ হাজার মানুষ : ভারতের নদী আগ্রাসন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি

ভারতের নদী আগ্রাসন ও স্রোতের গতি সরিয়ে দেয়ার কারণে তিস্তার ভাঙনে ছোট হয়ে যাচ্ছে লালমনিরহাটের দহগ্রাম ছিটমহল। একইভাবে মহানন্দার ভাঙনে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলাও ছোট হয়ে যাচ্ছে। খোদ তেঁতুলিয়া উপজেলা সদরটি এখন অস্তিত্বের হুমকিতে। অব্যাহত নদী ভাঙনে এই দুই এলাকার আয়তন কমে নদতিে বিলীন হযে যাচ্ছে। অপরদিকে ভারতের দিকে চর জেগে ওঠার তাদের ভূমির পরিমাণ বাড়ছে। ভারত তাদের তীরে নদীতে গ্রোয়েন নির্মাণ করায় স্রোতের ধাক্কা লাগে বাংলাদেশের তীরে। প্রবল স্রোতের ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে ভেঙে যাচ্ছে নদীর পাড়। নদী গ্রাস করছে ফসলের জমি, মানুষের বাড়িঘর। তিস্তার অব্যাহত ভাঙনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে দহগ্রাম ছিটমহলের ১৫ হাজার অধিবাসী। ভারতের ঠেলে দেয়া স্রোত প্রতিরোধ করতে না পারলে ছিটমহলটি নদীতে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে স্থানীয় মানুষ। চলতি বছরেই তিস্তার ভাঙনে দহগ্রামের দুই কিলোমিটারের বেশি এলাকা নদীতে তলিয়ে গেছে। ভারতের নদী আগ্রাসন নীতির কারণেই দহগ্রাম ছিটমহল ভাঙনের কবলে পড়েছে বলে মনে করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। বহুল আলোচিত ভারতের ভূ-খণ্ডে তিনবিঘা করিডোর অতিক্রম করে প্রবেশ করতে হয় দহগ্রাম ছিটমহলে। সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকে করিডোর। বিকাল ৬টার পর করিডোর বন্ধ করে দেয় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীরা। ছিটমহলটির একপাশে বয়ে গেছে তিস্তা নদী। কিন্তু ভারত তিস্তার তীরে পাথরের ব্লক ফেলে পানির স্রোত ছিটমহলের দিকে সরিয়ে দেয়ায় অব্যাহতভাবে ভাঙছে। অব্যাহত ভাঙনে চলতি বছরেও দহগ্রামের ২ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি এলাকা তিস্তার তলিয়ে গেছে। এভাবে প্রতি বছরই তারের জমি ভেঙ্গে নদীতে বিলীন হচ্ছে। এদিকে লালমনিরহাট জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড দাবি করছে দহগ্রামে তিস্তায় কোনো ভাঙন নেই। তবে জেলা প্রশাসক ভাঙনের কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন তিস্তার ভাঙনের কারণে দহগ্রাম ছিটমহলের ৫০টি বাড়ি চলতি বছর সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

গত ২ আগস্ট লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ছিট মহলের সৈয়দপাড়া ও কাদেরের চরের লোকজনের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, নদীর অপর তীরে ভারতের কুচবিহারের কুচকিবাড়ির হেকমততলায় ভারত কৌশলে নদীর স্রোত ছিটমহলের দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা ভারত এই এলাকায় ভারত পাথরের ব্লক ফেলা অব্যাহত রেখেছে। ভারত তাদের তীরে

www.pathagar.com

পাথরের ব্লক ফেলে পানির স্রোত অপরপাড়ে সরিয়ে দিচ্ছে। নদীর এই পাড়ে দাঁড়িয়ে ভারতের ব্লক ফেলার দৃশ্য দেখা যায়।

দহগ্রাম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড মেম্বর সৈয়দ বাবুল প্রধান আমার দেশকে বলেন, তিস্তার ভাঙন ঠেকাতে না পারলে দহগ্রাম ছিটমহলটি বিলীন হয়ে যাবে। তিনি জানান, গত কয়েক বছরে ৫ কিলোমিটারের বেশি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। ক্রমেই ভেঙে ছিটমহলের আয়তন ছোট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ফসলের জমি হারাচ্ছে, বাড়িঘর নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই ইতোমধ্যে জমি, ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

এই ছিটমহলে কাদেরের চরের অধিবাসী ৭৫ বছরের বৃদ্ধ আবদুর মজিদ জানান, তার ১৬ বিঘা জমি তিস্তার ভাঙনে হারিয়েছেন। তিনবার বাড়ি পরিবর্তন করেছেন। বসতভিটার সর্বশেষ জায়গাটি চলতি বছর নদীতে চলে গেছে। তিনি বলেন, ভারত নদীর স্রোত পরিবর্তন করে ছিটমহলের দিকে সরিয়ে না দিলে এই ভাঙন হতো না। গত কয়েক বছর ধরে ভারত নদীর এই স্রোত সরিয়ে দেয়ার কৌশল নিয়েছে বলে জানান তিনি।

দহগ্রামের ভাঙন কবলিত লোকরা জানান, ভারত নতুন করে কুচবিহারের পারপালতলি ও হেকমত ক্যাম্পের পাশে নতুন করে পাথরের ব্লক ফেলছে। এতে পানির স্রোত দহগ্রামের দিকে আরও বেশি প্রবল বেগে আঘাত হানছে।

নদী ভাঙন ঠেকাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড দহগ্রামে কোনো উদ্যোগ নিয়েছিল কিনা জানতে চাইলে সৈয়দ বাবুল মেম্বার জানান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বার বার এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত করা হচ্ছে। কিন্তু ভাঙন ঠেকাতে কোনো উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয়নি। তিনি বলেন, বিগত জরুরি অবস্থার সরকারের সময় ২০০৮ সালে তৎকালীন সেনাপ্রান দহগ্রাম সফরে এসে নদী ভাঙন ঠেকানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। মইন উ আহমেদ নদীতে বাঁশ দিয়ে তীরের পানির স্রোতের ধাক্কা ঠেকানোর জন্য একটি প্রকল্পও উদ্বোধন করেছিলেন। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর আর কোনো বাশ দুই বছরেও লাগেনি। যে বাঁশগুলো দিয়ে মইন উ আহমেদ পানির স্রোত ঠেকানোর জন্য প্রকল্প উদ্বোধন করেছিলেন সেই বাঁশগুলো দু'দিন পরই নদীতে ভেসে গেছে। ইউপি মেম্বার সৈয়দ বাবুল প্রধানসহ দহগ্রামের লোকরা বলেন, মইন উ আহমেদ ছিটমহলবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তারা বলেন, তাদের এই প্রতারণার বিচার হওয়া উচিত।

সৈয়দপাড়ার বৃদ্ধ মকবুল আহমদ বলেন, ছিটমহলবাসী এমনিতেই ১২ ঘণ্টা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী দিয়ে অবরুদ্ধ থাকে। তার ওপর নদী ভাঙন অব্যাহত থাকলে যাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না। তিনি বলেন, মইন উ আহমেদ পানির স্রোত ঠেকানোর প্রকল্প উদ্বোধন করায় ছিটমহলবাসী আশ্বস্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই অসহায় লোকদের সঙ্গে এরকম প্রতারণা করেছেন যার জন্য তার বিচার হওয়া দরকার। একজন সেনাপ্রান কেন ছিটমহলবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করবেন এটাই তাদের প্রশ্ন।

৩ আগস্ট দুপুরে লালমনিরহাট পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যালয়ে গিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীকে পাওয়া যায়নি। তবে মিজানুর রহমান নামে একজন প্রকৌশলী জানান, নির্বাহী প্রকৌশলী মতিন সরকার জরুরি মিটিংয়ে যোগ দিতে বাইরে রয়েছেন। দহগ্রামে তিস্তার ভাঙন ঠেকাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোনো উদ্যোগ আছে কিনা জানতে চাইলে প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, তিনি এখানে

www.pathagar.com

নতুন যোগদান করেছেন। তবে বিষয়টি জেনে জানাচ্ছেন বলে প্রতিবেদকের সামনেই মোবাইলে নির্বাহী প্রকৌশলীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। মোবাইলে কথা শেষে প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, স্যার জানিয়েছেন গত শনিবার তিনিসহ অপর একজন প্রকৌশলী দহগ্রামে গিয়েছিলেন। তারা তিস্তার কোনো ভাঙন দেখতে পাননি।

এদিকে জেলা প্রশাসক আলাউদ্দিন ফকিরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিস্তার ভাঙনের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, চলতি মৌসুমে ভাঙনের কারণে ৫০টির বেশি পরিবারকে সরিয়ে আনতে হয়েছে। তিনি তিস্তার অব্যাহত ভাঙনের কথা স্বীকার করলেও ভাঙন ঠেকাতে সরকারের উদ্যোগ আছে কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি।

এদিকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়ও একই অবস্থা। ৩১ জুলাই তেঁতুলিয়ায় গিয়ে দেখা গেছে মহানন্দা অব্যাহতভাবে ভাঙছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, ভারতীয় বিএসএফের বাধার কারণে পানি উন্নয়ন বোর্ড এখানে তীর সংরক্ষণে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। ভাঙন ঠেকাতেবিগত জোট সরকারের সময় তেঁতুলিয়া শহর রক্ষা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। নদী ভাঙন ঠেকাতে তৈরি করা হয়েছিল পাথর-সিমেন্টের ব্লক। কিন্তু বিএসএফ বাধা দেয়ায় ব্লক ফেলা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ভারতীয় তীরে ব্লক ফেলে স্রোত তেঁতুলিয়ার দিকে সরিয়ে দেয়ায় ভাঙন বেড়েছে। চর জাগছে ভারতের সীমান্তে। এছাড়াও মহানন্দার উজানে সীমান্তের ভেতরে জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ীতে ভারত বাঁধ দিয়ে পানির স্রোতের গতি পরিবর্তন করছে। অব্যাহত ভাঙনের কারণে তেঁতুলিয়া উপজেলা সদরটি এখন হুমকির মুখে পড়েছে। থানা ভবনটিও রয়েছে ভাঙনের হুমকিতে।

চাঁপাই, নওগাঁর দুর্গম এলাকার বিওপিতে যাওয়ার রাস্তা নেই

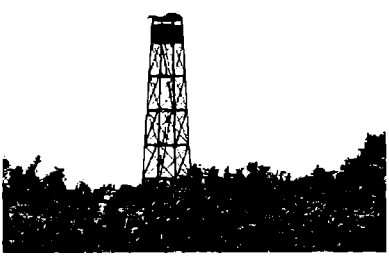

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁর দুর্গম সীমান্ত এলাকার অনেক বিডিআর ক্যাম্পের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ নেই। কাঁচা রাস্তায় কাদামাটি মাড়িয়ে বিডিআরের সীমান্ত ফাঁড়ি বা বিওপিতে পৌঁছতে হয়। রাস্তা না থাকায় এই এলাকায় বিডিআরের নিয়মিত সীমান্ত টহল দিতে হয় কাদামাটি মাড়িয়ে। রাস্তায় কাদার কারণে অনেক জায়গায় বিডিআর লুঙ্গি পরেও টহলে নামে। তাদের বিপরীতে ভারতীয় বিএসএফ উন্নতমানের রাস্তায় বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল ও গাড়ি দিয়ে সীমান্ত টহল দেয়। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষির কোনো বিওপিতে সাহায্যের প্রয়োজন হলে ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সব পৌঁছে যায়। কাদামাটি মাড়িয়ে পাহারা দেয়ার সময় বিডিআর তাদের প্রতিপক্ষ বিএসএফের এই টহল পর্যবেক্ষণ করে।

www.pathagar.com

অপরদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এলাকায় কোনো বিওপি ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণের শিকার হলে ব্যাটালিয়ন থেকে সাহায্য পৌঁছতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। তার ওপর এখন বিওপিগুলোতে কোনো ভারি অস্ত্র নেই। গত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে হত্যাযজ্ঞের পর বিওপিগুলো থেকে সরিয়ে আনা ভারি অস্ত্র এখনও ফেরত দেয়া হয়নি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে অবস্থিত ব্যাটালিয়নে যেসব বিডিআর জওয়ান কর্মরত আছেন তাদেরও নিরস্ত্র অবস্থায় দেখা গেছে। শুধু সীমান্ত এলাকার বিওপিগুলোতে সাধারণ রাইফেল রয়েছে বিডিআর জওয়ানদের সঙ্গে। রাইফেলে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত গোলাবারুদের মজুতও বিওপিগুলোতে নেই। এই সীমান্তে বিএসএফ অনেকটা বেপরোয়া আচরণ করছে। গত ৩ আগস্ট শিবগঞ্জের কুপিতলা সীমান্তে ২ যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ। তার কয়েক দিন পর ধান ক্ষেতে কাজ করার সময় আরো একজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ১০ বছরে বিএসএফ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে ৫০ জন মানুষ হত্যা করেছে। এই সীমান্তে কর্মরত একাধিক বিওপি কমান্ডার জানান, কেউ আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করলে গুলি করে মেরে ফেলার কোনো বিধান নেই। তার জন্য নির্ধারিত আইনে বিচারের ব্যবস্থা আছে। হত্যার কোনো বিধান আইনে নেই। কিন্তু নোম্যান্সল্যান্ডে ক্ষেতে-খামারে কাজ করার সময়েও ভারতীয় বাহিনী মানুষকে গুলি করে হত্যা করছে। কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে এসে মানুষের গরুও নিয়ে যায় বিএসএফ।

গত ৩ দিন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নওগাঁর পোরশা, সাপাহার,পত্নিতলা ও ধামইরহাট উপজেলার দুর্গম সীমান্ত এলাকাগুলোতে গিয়ে এই চিত্র দেখা গেছে। অন্যান্য এলাকার বিওপিতে কর্মরত বিডিআর জওয়ানদের মতো এ উপজেলাগুলোর সীমান্তে কর্মরত বিডিআর জওয়ানরাও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আতঙ্কে দিন কাটায়। বিডিআরের অনেকগুলো বিওপিতে দেয়াল বা গেটে, 'মনোবল, ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতা;' শ্লোগান লেখা রয়েছে। কিন্তু তাদের স্লোগানের প্রথমটি 'মনোবল' অনুপস্থিত। বিডিআর-এর কী হবে কী হচ্ছে এই উৎকণ্ঠা দেখা গেছে জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে। অনেকেই বলেন, বিডিআর জওয়ানরা দুর্গম এলাকায় জীবনবাজি রেখে সীমান্ত রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে কাজ করলেও ঢাকায় বসে অনেকে বিএসএফের ভাষায় কথা বলছে। যাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় তাদের পরামর্শ নিয়ে বিডিআর পুনর্গঠনের কথাও শুনতে হচ্ছে। এ নিয়ে বিডিআর জওয়ানদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ দেখা গেছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ স্থলবন্দরের কাছে শিয়ালমারি কোম্পানি সদরে বৃষ্টি হলে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় থাকে না। এমনকি মোটরসাইকেল চালিয়েও কোম্পানি সদরে পৌঁছানো কষ্টসাধ্য। রাস্তায় এতোই কাদা যে পায়ে হেঁটেও যাওয়া কষ্টকর। এই কোম্পানি সদরের একজন কর্মকর্তা জানান, কোম্পানিটির অধীন বিলবাতিয়া ও কামালপুর বিওপিতে যেতে চাইলে ১০ মাইল

www.pathagar.com

পথ ঘুরে পৌঁছতে হয়। রাস্তায় কোথাও হাঁটু পর্যন্ত কাদা থাকে। এখানে কথা বলে জানা গেছে এলাকাটি নওগাঁর পত্নিতলায় অবস্থিত একটি ব্যাটালিয়নের অন্তর্গত। ব্যাটালিয়ন সদর পৌঁছতে দেড়শ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। কোনো কারণে উত্তেজনা বা আক্রমণের শিকার হলে দেড়শ' কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ব্যাটালিয়নের সাহায্যে এখানে পৌঁছতে হবে। ততোক্ষণে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন এক জওয়ান। তাদের বিপরীতে ভারতের ৩টি কোম্পানির অধীনে অন্তত দশটি বিওপি রয়েছে। এছাড়া তিন থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যেই রয়েছে ভারতের ব্যাটালিয়ন সদরদফতর। এতে জরুরি প্রয়োজন হলে সেকেন্ড লাইন থেকে জরুরি সাহায্য পৌঁছতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগে।

শিবগঞ্জের মনাকষা সীমান্ত ফাঁড়িতে কোনোরকমে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়া গেলেও রঘুনাথপুর, মনোহরপুর, চৌকা ও মাসুদপুর সীমান্তে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। মটরসাইকেল রাস্তায় রেখেই পায়ে হেঁটে পৌঁছাতে আমাদের জরুরি প্রয়োজন হলে কীভাবে এসব বিওপিতে সাহায্য পৌঁছবে তা কেউ জানে না। এসব বিওপিতে কর্মরত জওয়ানদের রাত-দিন টহলে কাদা পানি মাড়িয়ে চলতে হয়। বিভিন্ন বিওপিতে কর্মরত জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারি অস্ত্র এখন আর বিওপিতে নেই। আক্রান্ত হলে ভারি অস্ত্রই ছিল তাদের মূল ভরসা। মর্টার থেকে শুরু করে ভারি অস্ত্রগুলো এখনো জব্দ রয়েছে। মনাকষা সীমান্ত ফাঁড়িতে একজন জওয়ান জানান, আক্রান্ত হলে ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা যুদ্ধ করে টিকে থাকার পর সেকেন্ড লাইনের সাহায্য আশা করা যায়। তারপরও ব্যাটালিয়ন বা অন্য কোনো বিওপি থেকে যারা সাহায্যের জন্য আসবেন তারা কেবল বন্দুকটি বহন করে আনতে পারবে। পায়ে হাঁটা পথে বেশিসংখ্যক গোলাবারুদ বহন করা যায় না। ভারি অস্ত্র পায়ে হেঁটে কেউ বহন করতে পারে না। এতে কোনো বিওপি এই মুহূর্তে আক্রমণের শিকার হলে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে তা বলা যাচ্ছে না বলে উল্লেখ করেন দুর্গম এলাকাগুলোর বিওপিতে কর্মরত জওয়ানরা। তারা বলেন, আগে ভারি অস্ত্রগুলো ছিল দুর্গম এলাকার বিওপির প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র। এই ভারি অস্ত্র এখন আর বিওপির অধীনে নেই। পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

শিবগঞ্জের কিরণগঞ্জ বিওপির বিপরীতে সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফের একটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার রয়েছে। বিডিআরের কোনো পর্যবেক্ষণ টাওয়ার আছে কিনা জানতে চাইলে বিওপির সামনের বড় বটগাছটি দেখিয়ে একজন জওয়ান বলেন, 'এই যে আমাদের টাওয়ার'। একাধিক বিওপি কমান্ডার জানান, সীমান্তে কোনোরকমে একটি বিওপি স্থাপনের পর সেখানে যাতায়াত বা টহলের যোগাযোগের কথা আর কেউ চিন্তা করে না। তারা বলেন, যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা না নিয়ে ঢাকায় বসে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সে কারণে মাঠ পর্যায়ের জওয়ানরা কীভাবে সীমান্ত রক্ষায় দায়িত্ব পালন করছে এটা কারো ভাবনায় থাকে না। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার

www.pathagar.com

পোলাডাঙ্গা, বকচর, জহরপুর সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে যেতে হলে একাধিক নদী ও খাল পাড়ি দিতে হয়। এসব ফাঁড়ির অবস্থান দুর্গম। আক্রান্ত হলে তাদের ভরসা হলো স্থানীয় মানুষের সাহায্য।

নওগাঁ জেলার পোরশা উপজেলায় নিতপুর সীমান্ত ফাঁড়ি ও হাফনিয়া সীমান্ত ফাঁড়ি মিলে প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকা টহল দিতে হয়। পুরোটাই গ্রামের কাঁচা রাস্তা না হয় ধানক্ষেতের আইল। এছাড়া আদাতলা, আগ্রাদ্বিগুনসহ বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে কর্মরত বিডিআর জওয়ানরা জানান, একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় কাদার কারণে হাঁটার সুযোগ থাকে না। তারপরও এই কাদামাটিতেই তাদের টহল দিতে হয়। তারা বলেন, বিএসএফের মতো এতো উন্নত যানবাহন ও সুযোগ-সুবিা না দিলেও অন্তত টহলের জন্য রাস্তার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সীমান্ত রক্ষার স্বার্থেই টহলের জন্য রাস্তা তৈরির দরকার বলে মনে করেন বিডিআর জওয়ানরা। তারা বলেন, মাঠে এসে বাস্তব অবস্থা দেখে পিলার টু পিলার নিরাপত্তার পরিকল্পনা নিতে হবে। নীতি নির্ধারকদের দেখতে হবে একটি সীমানা পিলার থেকে আরেকটি পিলারের যাতায়াত ব্যবস্থা কত কঠিন। তাদের মতে মাঠের অভিজ্ঞতা না নিয়ে ঢাকায় বসে পরিকল্পনা করে ও প্রতিপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে বিডিআর পুনর্গঠন করলে সীমান্ত সুরক্ষা হবে না।

টর্চ হাতে সীমান্ত পাহারায় বিডিআর

সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফের সার্বক্ষণিক কড়া নজরদারিতে থাকে বিডিআর। এমনকি রাতেও সার্চলাইটের আলো ফেলে বিডিআরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে বিএসএফ। এজন্য ভারতীয় সীমান্ত এলাকাজুড়ে বসানো হয়েছে লাইটপোস্ট। সঙ্গে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার থেকে সার্চলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভেতরে আলো ফেলা হয়। সে তুলনায় বিএসএফ বা চোরাচালানীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বিডিআরের কোনো ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুতের অভাবে রাতে বিডিআর ক্যাম্পগুলো ভুঁতুড়ে অন্ধকারে রূপ নেয়। বিপরীতে সীমান্ত ভারতীয় অংশে লাইটপোস্টের আলোয় ঝলমল করে। অথচ মূল সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বিডিআর ক্যাম্প থাকে অন্ধকারে। বিএসএফের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ তো দূরের কথা, টর্চলাইটের আলো দিয়ে কোনো রকমে নিজেদের সামনের রাস্তা দেখে হাঁটে বিডিআর। একটি টহল গ্রুপে আবার সবার হাতে টর্চলাইট থাকে না। উত্তরাঞ্চলে ৮জেলার সীমান্ত এলাকায় রাতের দৃশ্য এ রকমই দেখা গেছে। বিভিন্ন সীমান্তের বিডিআর জওয়ানারা জানান, বিএসএফ যে রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তার একশ'ভাগের একভাগও বিডিআর পায় না। তারপরও সীমান্তের প্রতি ইঞ্চি মাটি

www.pathagar.com

রক্ষার কাজ করছে বিডিআর। বিডিআর জওয়ানরা বলেন, সীমান্ত লাইটপোস্ট তো দূরের কথা, কর্মরত বিডিআর জওয়ানরা বিওপি ও কোম্পানি সদরগুলোতে বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থাও নেই। তার ওপর বিডিআরের নাম নিয়েও চলছে টানাটানি। বিভিন্ন বিওপিতে কর্মরত জওয়ানরা বলেন, সুযোগ-সুবিধা না বাড়িয়ে নাম পরিবর্তন করে কোনো লাভ হবে না। জওয়ানরা নাম পরিবর্তন চান না, সীমান্ত রক্ষাবাহিনীর উন্নতি চান। তারা বলেন, বাসস্থানের সঙ্কট রয়েছে প্রতিটি বিওপি ও কোম্পানি সদরে। মাত্র ৮ জনের বসবাস উপযোগী একটি রুমে গাদাগাদি করে ১৮ থেকে ২৫ জন পর্যন্ত বসবাস করেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিডিআর জওয়ানরা বাহিনীর নাম এবং পোশাকের পরিবর্তনও চান না। ২১৩ বছরের পুরনো এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে ধারণ করেই সামনে অগ্রসর হতে চান তারা। পোশাক এবং নাম পরিবর্তন নিয়ে বিডিআর জওয়ানদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ এবং আতঙ্কও দেখা গেছে। আতঙ্কের কারণে কেউ এ বিষয়ে সরাসরি মুখ খুলে কিছু বলতে চান না। বিওপিগুলোতে 'এ' এবং 'বি' টাইপের বিল্ডিং রয়েছে। তবে 'বি' টাইপের বিল্ডিংয়ের সংখ্যাই বেশি। 'বি' টাইপের বিল্ডিংয়ে ৪টি এবং 'এ' টাইপের বিল্ডিংয়ে ৫টি করে রুম রয়েছে। এ রুমগুলোর মধ্যে ছোট একটি রুমে বিওপি বা কোম্পানি কমান্ডার, ছোট আরও একটি রুমে একজন হাবিলদার থাকেন। এছাড়া একটি রুমে কোম্পনি বা বিওপিগুলোর অস্ত্র, একটি রুমে রেশনের মালামাল, একটি সিগন্যাল রুম ও অপর একটি রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাঝের একটি রুমে বিডিআর জওয়ানরা গাদাগাদি করে বসবাস করেন। জওয়ানদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত রুমটিতে হাঁটা-চলার কোনো সুযোগ নেই। তাদের ব্যবহার উপযোগী কাপড় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার জন্য প্রত্যেকেরই ট্রাঙ্ক রয়েছে। এই ট্রাঙ্ক ঘরের ভেতরেও রাখার সুযোগ পান না অনেকে। জয়গার অভাবে টাঙ্ক ঘরের বারান্দায় রাখতে হয়। দিনাজপুরের হাকিমপুর উপজেলার বাসুদেবপুর সীমান্তে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বিডি আরের কোম্পানি সদরে ৩৫ জনের বেশি জওয়ান রয়েছেন। এখানে কোম্পানি কমান্ডার জানান সীমান্ত এলাকার তুলনায় সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। তার মতে, সাধারণভাবে সীমান্ত পর্যবেক্ষণে ১০০ জনের বেশি সৈন্য এখানে থাকা প্রয়োজন। অথচ আছে মাত্র ২৫ জন। তিনি কোম্পানি সদরের জন্য তৈরি বিল্ডিং দেখিয়ে বলেন, এ ঘরটিতে যে রুমে জওয়ানরা বসবাস করেন তা খুবই অমানবিক। হেঁটে ৮-১০ ঘণ্টা টহলের পর কোম্পানিতে ফিরে শান্তিমত ঘুমানোর সুযোগ নেই। একটি রুমে গাদাগাদি করে জওয়ানদের থাকতে হয়। তিনি আরও জানান, জওয়ানদের ব্যবহারের জন্য যে রুমটি রয়েছে সেখানে ৮ জন থাকার উপযোগী। কিন্তু নিয়মিত ২২ জনের বেশি থাকতে হয়। ওই কর্মকর্তা বলেন,২১৩ বছরের পুরনো এ বাহিনী এভাবেই সীমান্ত পাহারা দিয়ে আসছে। একই রকমের হতাশা ব্যক্ত করেন অন্যান্য কোম্পানি সদর ও বিওপি কমান্ডাররা। তেঁতুলিয়ার মাগুরমাড়ি ও বাংলাবান্দা সীমান্ত ফাঁড়ি, চাঁপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কিরণগঞ্জ ও কুপিতলা, নওগাঁর সাপাহার

www.pathagar.com

উপজেলার আদাতলা সীমান্ত বিওপিতে গেলে বিডিআর জওয়ানরা জানান, ক্যাম্পের ভেতর একটি রুমে ২২ থেকে ২৫ জন জওয়ানকে গাদাগাদি করে রাত যাপন করতে হয়। দিন ও রাতের অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। তখন গরমে কষ্ট আরও বেড়ে যায় বলে জানান তারা। নীলফামারীর ডোমারের ডাঙ্গাপাড়া সীমান্ত অবস্থিত বিওপি, লালমনিরহাট সদরের মোগলহাট, আদিতমারী উপজেলার দূর্গাপুর বিওপি, হাতিবান্দার সিঙ্গিমারী বিওপি, কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীর পাথরডুবি ইউনিয়নের ময়দান বিওপি, রৌমারীর বড়াইবাড়ীসহ বিভিন্ন বিওপিতে কর্মরত জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে আভাস পাওয়া গেছে তারা বাহিনীর নাম পরিবর্তন ও পোশাক পরিবর্তন চান না। তাদের মতে, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করে শুধু নাম এবং পোশাকের পরিবর্তন করে গুণগতমানের কোনো উন্নতি হবে না। অনেক বিওপি ও কোম্পানি কমান্ডার বলেন, ২১৩ বছর আগে ব্রিটিশ আমলে সীমান্ত রক্ষার জন্য এ বাহিনী তৈরি হয়েছিল। বাহিনীর একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে উল্লেখ করে তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধে বিডিআরের বড় ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের জন্য ২ জন বীর শ্রেষ্ঠ হলেন বিডিআর জওয়ান। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিডিআর-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল উল্লেখ করে তারা বলেন, এই বাহিনীর ঐতিহ্যের কারণেই বহুগুণ বেশি ক্ষমতাশালী ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ভারতীয় বিএসএফ কখনও সম্মুখযুদ্ধে বিডিআরকে পরাজিত করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে তারা ২০০১ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল বড়াইবাড়ী যুদ্ধ, ১৯৯৮ সালে দিনাজপুরের হিলি যুদ্ধসহ সীমান্তের বিভিন্ন সংঘর্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, কোনো সীমান্ত সংঘর্ষে বিডিআর পরাজিত হয়নি। ৪ থেকে ৫ গুণ বেশি শক্তি নিয়ে বিএসএফ এসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাদের মতে, শুধু মনোবল ও ঐতিহ্যের কারণেই বিডিআর সবসময় সীমান্তে বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু সেই চাঙ্গা মনোবল এখন আর অটুটু নেই। বর্তমানে বাঁচা-মরার লড়াই করছে বিডিআর। মানসম্মান নিয়ে চাকরি থেকে বিদায় নেয়ার অপেক্ষায় সবাই। হিলি সিপিতে কর্মরত একজন বিডিআর কর্মকর্তা জানান, গত ফেব্রুয়ারিতে তার পদোন্নতি হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির বিপর্যয়ের কারণে আর এ পদোন্নতি হয়নি। তখন থেকে বিডিআরের পদোন্নতি স্থগিত রয়েছে। এর মধ্যে যারা পদোন্নতি পাওয়ার প্রত্যাশায় ছিলেন তারা সবাই হতাশায় ভুগছেন। কবে তাদের ফাইল আবারও চালু হবে, এটি কেউ জানে না। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার ঘটনা বিডিআরকে ধ্বংসের একটি চক্রান্ত হিসেবে উল্লেখ করে অনেক বিওপি কমান্ডার বলেন, এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের পুরনো এই বাহিনী। দেশের সীমান্ত এলাকায় রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এই বাহিনীর শত্রুরাই এতবড় ক্ষতি করতে পারে বলে উল্লেখ করেন তারা।

www.pathagar.com

জরুরি সরকার নানা কৌশলে বিডিআরকে দুর্বল করেছে

দুই লাখ স্থলমাইন ধ্বংস করেছে মইন উ আহমেদ নিয়ন্ত্রিত জরুরি অবস্থার সরকার : প্রতিবেশী কোনো দেশই স্থলমাইন ধ্বংস করেনি : অপেশাদারি কাজে বেশি ব্যস্ত রাখা হয় বিডিআরকে

গরিবের পারমাণবিক অস্ত্র হিসেবে পরিচিত স্থলমাইন নেই বাংলাদেশে। সাবেক সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দেশের সব স্থলমাইন ধ্বংস করে দেয়া হয়। জাতিসংঘের সঙ্গে এক সনদে স্বাক্ষরের অজুহাত দিয়ে ধ্বংস করা হয় স্থলমাইন। অথচ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ কেউ স্থলমাইন ধ্বংস করেনি। বিডিআর জওয়ানদের সঙ্গে দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আলাপকালে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, স্থলমাইন সেনাবাহিনীর একটি অস্ত্র হলেও রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের নিরাপত্তার জন্য এটি অ্যাটমবোমা হিসেবে কাজ করে। স্থলমাইনকে গরিবের অ্যাটমবোমা বলা হয় বলে উল্লেখ করেন সীমান্তরক্ষায় দায়িত্বরত বিডিআর জওয়ানরা। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে বিদেশি শক্তির স্থলপথে আক্রমণ ঠেকাতে স্থলমাইনের বিকল্প কোনো অস্ত্র এখনও তৈরি হয়নি। স্থলমাইন দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে ট্যাংক আক্রমণও ঠেকিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের অস্ত্রভাণ্ডারে রক্ষিত ২ লাখ স্থলমাইন তখন ধ্বংস করে দেয় মইন উ আহমদ। বিডিআর জওয়ানরা বলেন, যাদের বিরুদ্ধে সীমান্ত পাহারা তাদের স্থলমাইন ভাণ্ডার অটুট রয়েছে। এর বাইরে ইসরাইল থেকে নতুন আধুনিক অস্ত্র আনা হয়েছে বিএসএফের জন্য।

বিডিআর জওয়ান ও বিডিআর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপকালে তারা জানান, ২০০১ সালে বড়াইবাড়ী যুদ্ধে পরাজয়ের পর ভারত সীমান্তে বিএসএফেকে আরও শক্তিশালী করেছে। আগের পুরনো হাতিয়ার এসএলআর, মর্টার, মেশিনগান, এলএমজি পরিবর্তন করে ইসরাইল থেকে নাইট ভিশন, স্নাইপার রাইফেল, অ্যাসল্ট রাইফেল-ট্রাভোর-২৭, এম-১৬ অ্যাসল্ট রাইফেল, এমপিজি-১ স্নাইপার রাইফেল, এমপি-ফাইভ সাবমেশিনগান বিএসএফকে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি উন্নত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়।

বিপরীতে বিডিআরের জন্য গত কয়েক বছরে আধুনিক কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়নি। বিডিআরকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে গত জরুরি অবস্থার সরকারের সময় নানা কৌশলে দুর্বল করা হয়েছে। সীমান্ত পাহারার পরিবর্তে দোকানদার বানানো হয়েছে বিডিআরকে। আগের পুরনো অস্ত্র দিয়েই চলছে সীমান্ত পাহারা। সেই পুরনো অস্ত্রগুলো ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির পর থেকে পুলিশের হাতে জব্দ করা হয়। এতে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিএসএফের বিপরীতে বিডিআর এখন একরকম নিরস্ত্র অবস্থায় সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিডিআরের মূল স্লোগান হচ্ছে কঠিন প্রশিক্ষণ-সহজ যুদ্ধ। কঠিন প্রশিক্ষণ,ম্যান ম্যানেজমেন্ট এবং দক্ষ কমান্ডের কারণে বিডিআরের লড়াকু মনোবল ছিল। বিএসএফের তুলনায় উন্নত প্রশিক্ষণ, দক্ষ কমান্ড ও ম্যান ম্যানেজমেন্টের কারণে সীমান্তের কোনো যুদ্ধে কখনও পরাজিত হয়নি বিডিআর। অসম জনবল ও যানবাহনে বহুগুণ শক্তিশালী বিএসএফ সীমান্তে বিডিআরকে সবসময়ই সমীহ করে চলেছিল। কিন্তু বিডিআরকে বিএসএফের তুলনায় দুর্বল করার লক্ষ্যে কৌশলে সীমান্তে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে ভিন্নকাজে বেশি ব্যস্ত রাখা হয়।

বিডিআর জওয়ানরা বলেন, মইন উ আহমেদের নিয়ন্ত্রিত জরুরি অবস্থার সরকার বাংলাদেশকে স্থলমাইনশূন্য করে সীমান্ত নিরাপত্তাকে দুর্বল করে দিয়ে গেছে। কার স্বার্থে জরুরি অবস্থার সরকার দেশকে স্থলমাইনশূন্য করে সীমান্ত নিরাপত্তা দুর্বল করেছে এ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিডিআর জওয়ানরা আক্ষেপ করে বলেন, জরুরি অবস্থার সরকার মজুত অস্ত্র ধ্বংসের পাশাপাশি বিডিআরকে দিয়ে মুদির দোকানদারি করিয়ে ২১৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি বাহিনীর পোশাক ও ইউনিফর্মের অমর্যাদা করেছে। এতে বিডিআরের মনোবল ও সীমান্তের সার্বিক নিরাপত্তা স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। জরুরি অবস্থার সরকারের সময় বিডিআরকে সীমান্ত নিরাপত্তার চেয়ে মুদির দোকানদারিতে এতোই বেশি ব্যস্ত রাখা হয়েছিল যে তখন অফিসাররা সৈনিকদের ভালো-মন্দের খোঁজ নেয়ারও সুযোগ পাননি। অনেক সৈনিক নিয়মিত ছুটি তো দূরের কথা, বছরে একবারও ছুটি পাননি বলে জানান তারা। পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় অনেকেই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর বিডিআরের মনোবল আরও ভেঙে পড়ে।

বিডিআর জওয়ানরা জানায়, জরুরি অবস্থার সরকারের সময় সীমান্ত নিরাপত্তার চেয়ে মুদির দোকানদারিসহ অপেশাদারি নানান কাজে বেশি ব্যস্ত রাখায় বিডিআরের প্রশিক্ষণ, স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটায় সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যার রেশ বিডিআরকে বহন করতে হচ্ছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তায় কর্মরত বিডিআর জওয়ানদের সঙ্গে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আলাপকালে তারা এই উদ্বেগের বিষয়গুলো তুলে ধরেন। বিডিআর জওয়ানরা বলেন, স্থলমাইন সাধারণত সেনাবাহিনীর একটি অস্ত্র। তারপরও যুদ্ধক্ষেত্রে বা গেরিলাযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য স্থলমাইন ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কারণে বাংলাদেশ আক্রমণের শিকার হলে গেরিলাযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র স্থলমাইন না থাকায় শত্রুকে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে যাবে। কারণ শত্রুপক্ষ জানে আমাদের হাতে কোনো স্থলমাইন নেই। তাই তারা নির্বিঘ্নে স্থলপথে এগিয়ে আসবে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জেনারেল মইন উ আহমেদের নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতিসংঘের সঙ্গে একটি চুক্তির কথা বলে সব স্থলমাইন একযোগে ধ্বংস করে দেয়। মইন উ আহমেদের অতি উৎসাহে স্থলমাইন ধ্বংসে উদ্যোগ নেয়া হয় বলে দাবি করেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো।

www.pathagar.com

বিএসএফের সহায়তায় আসছে মাদকসহ নানা পণ্য

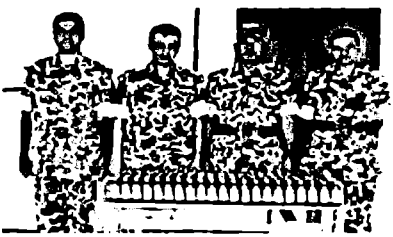

উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে চোরাইপথে আসা ভারতীয় নিম্নমানের সার, গাঁজা, হেরোইন ও ফেনসিডিলের কারণে উদ্বিগ্ন সীমান্ত এলাকার মানুষ। ভারতের দু'স্তরে তৈরি করা কাঁটাতারের বেড়া ও বিএসএফের সার্বক্ষণিক নজরদারি এড়িয়ে প্রতিদিন চোরাচালানিরা এসব পণ্য নিয়ে আসছে। কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে চোরাচালানির পণ্যআনতে ভারতীয় বিএসএফের সহযোগিতা রয়েছে বলে দাবি করেন সীমান্ত এলাকার মানুষ। বিএসএফের সহযোগিতা ছাড়া কাঁটাতার অতিক্রম করে চোরাচালানের পণ্য দেশে প্রবেশ করাকে অলৌকিক হিসেবে মনে করেন সীমান্ত এলাকার মানুষ। রাতে বাংলাদেশ সীমান্তে বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে চোরাচালানির পণ্য দেশে প্রবেশ করে। সীমান্তজুড়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের আলো থাকলেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকে ভুঁতুড়ে অন্ধকার। এ সুযোগটিই নেয় চোরাচালানিরা। কুড়িগ্রামের রৌমারী, রাজীবপুর, ভুরুঙ্গামারী; লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, আদিতমারী, মোগলহাট; পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, বাংলাবান্দা, মাঝিপাড়া; নীলফামারীর ডোমরা, ডালিয়া, ছিলিহাট; দিনাজপুরের হাকিমপুর, হিলি, বাসুদেবপুর; চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের সোনা মসজিদ, কুপিতলা, মনাকষা, কিরণগঞ্জ; নওগাঁর সাপাহার, পোরশা, পত্নীতলাসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্তে সরেজমিনে দেখা গেছে-নিম্নমানের সার ও মাদক প্রকাশ্যেই বেচাকেনা হয়। কৃষি মৌসুমে প্রকাশ্যে জমিতে ভারতীয় নিম্নমানের সার ব্যবহার করেন কৃষক। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, ভারতীয় নিম্নমানের সারের কারণে এলাকায় ফসলের ফলন কমে যাচ্ছে। তারপরও দাম কম থাকায় মানুষ এসব সার ব্যবহার করছে।

এসব সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, একসময় ভারতীয় শাড়ি ছিল চোরাচালানির শীর্ষ তালিকায়। এখন আর শাড়ি তেমন আসে না। এখন মরণ নেশা হেরোইনসহ নানা রকমের মাদকদ্রব্য আসছে। সঙ্গে আসছে অবৈধ অস্ত্র।

সীমান্তে ভারতীয় কাঁটাতারের দু'স্তরের কঠিন বেড়া, বিএসএফের সার্বক্ষণিক নজরদারি এড়িয়ে চোরাচালানির এসব পণ্য কীভাবে দেশে প্রবেশ করে জানতে চাইলে সীমান্ত এলাকার লোকজন জানান, ভারতীয় বিএসএফের সহযোগিতা ছাড়া অবৈধ পথে ভারতীয় পণ্য দেশের ভেতরে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন বিডিআর ক্যাম্পে জওয়ানদের কাছে চোরাচালানের বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, অলৌকিক শক্তি ছাড়া কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে চোরাচালানির পণ্য দেশে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। কাঁটাতারের দুই স্তরে ঘনবেড়া মাপও অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু ফেনসিডিলসহ অন্য পণ্য আসে

www.pathagar.com

অবাধে। বিডিআর জওয়ানরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, মাদকের সঙ্গে কোনো সীমান্তেই বিডিআর আপস করে না। তারপরও ভারতীয় মাদকে দেশ সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মাদকের সংবাদ পাচ্ছে, বিডিআর সেখানেই হানা দিচ্ছে। সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ ও বিডিআর জওয়ানরা জানান, বিএসএফ সময়-সুযোগমত চোরাচালানি পণ্য দেশে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেয়। বিএসএফের সহযোগিতা না থাকলে কাঁটাতারের এই কঠিন বেড়া টপকানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া সীমান্তে নোম্যান্স ল্যান্ডের ভারতীয় অংশে জমিতে কাজ করার জন্য কৃষকদের যখন কাঁটাতারের বেড়া খুলে দেয়া হয়, তখনও বিএসএফের কড়া নজরদারি থাকে। বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ নির্ধারিত সময় কৃষকদের জন্য কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে রাখে। আবার নির্ধারিত সময়ে বন্ধ করে দেয়। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত গেট খোলা রাখা হয় ভারতীয় কৃষকের স্বার্থে। এর বাইরে কখনও চোরাচালানির মাধ্যমে পণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে হলে বিএসএফের সহযোগিতা ছাড়া গেট খোলার কোনো সুযোগ নেই।

লালমনিরহাটে মোগলহাট সীমান্তে ধরলা নদী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তকে ভাগ করেছে। মোগলহাটের পরিত্যক্ত রেল স্টেশনের শেষ প্রান্তে ধরলা নদীর তীরে মুসলিম নামে ভারতীয় একটি ছোট গ্রাম রয়েছে। ধরলা নদী পার হয়ে তাদের ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। সেখানে গেলে ৪ আগস্ট এই সীমান্তে অবস্থিত বিডিআরের একটি কোম্পানি সদরের বিডিআর জওয়ানরা জানান, ২০-২৫ পরিবারের এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করে চোরাচালান হচ্ছে। ভারতীয় পণ্য ধরলা নদী অতিক্রম করে এখানে এনে রাখা হলে বিডিআরের কিছুই করার থাকে না। কারণ সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত গ্রামটিতে প্রবেশ করলে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হবে। বিডিআর বিওপির এক সদস্য জানান, গত জুলাই মাসে গোলহাটের এ এলাকা থেকে ৫ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের মাদক তারা আটক করেছেন তারা। ভারতীয় এই গ্রামটির বাসিন্দা শের আলী জানান, নদীর পার হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেতে হয়। এজন্য তারা বাংলাদেশের স্থানীয় হাটবাজারকেই ব্যবহার করেন। ছেলেমেয়েরাও বাংলাদেশের স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া করে। এটি একটি ব্যতিক্রমী সীমান্ত। এখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। নদীটি দু'দেশকে ভাগ করেছে। মুসলিমপাড়া নামে ভারতীয় গ্রামটি নদীর তীরে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে জিরো পয়েন্টে অবস্থিত। গ্রামের সবগুলো পরিবার মুসলমান। এজন্য মুসলিম পাড়া হিসাবে পরিচিত। ধরলা নদী তাদের মূল বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। এজন্য মোগল হাটের পুরাতন রেল রাস্তায় গ্রাম স্থানান্তরিত হয়েছে।

তবে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা ও পাটগ্রামের সীমান্তজুড়ে কাঁটাতারের বেড়া সত্ত্বেও কীভাবে চোরাইপথে ভারতীয় পণ্য দেশে প্রবেশ করে জানতে চাইলে সীমান্তের গ্রামগুলোর মানুষ বলেন, অলৌকিকভাবে ভারতীয় মাদক ও নিম্নমানের সার বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদের মতে, লালমনিরহাটের এ অঞ্চলে কোনো

www.pathagar.com

শিল্প-কারখানা নেই। একশ্রেণীর মানুষ চোরাচালানিকে আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে বেঁছে নিয়েছে। চোরাচালানি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তারা বলেন, বিডিআর যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারপরও চোরাচালানির মাধ্যমে কোনো পণ্য আসছে না-এটা বলা যাবে না। এখানে বিডিআর জওয়ানরা আরও বলেন, সীমান্ত এলাকার তুলনায় বিডিআরের সংখ্যা অনেক কম। একদিকে টহলে গেলে আরেক দিক ফাঁকা হয়ে থাকে। এছাড়া ভারতীয় বিএসএফের মতো সার্বক্ষণিক নজরদারির কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপরও বিডিআর চোরাচালানি পণ্যের সন্ধান পেলেই হানা দিয়ে আটক করছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে একাধিক বিওপিতে বিডিআর জওয়ানরা জানান, তারা প্রতিদিনই ভারতীয় মাদক আটক করছেন। কঠিন কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে কীভাবে এসব পণ্য দেশে প্রবেশ করে–এটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

চোরাচালানির দিক থেকে ব্যতিক্রম তথ্য পাওয়া গেছে তেঁতুলিয়া সীমান্তে কর্মরত বিভিন্ন বিওপি ও কোম্পানি সদরের বিডিআর সদস্যদের কাছ থেকে। তেঁতুলিয়ার সাধারণ মানুষ ফেনসিডিলসহ ভারতীয় মাদকে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও বিডিআর জওয়ানরা জানান, এ সীমান্তে কোনো চোরাচালান নেই। কোনো চোরাচালানি না থাকায় তাদের আটকের তেমন তালিকাও নেই। তবে তেঁতুলিয়া সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গ্রাম ও তেঁতুলিয়া উপজেলা সদরের বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ এলাকায়ও ভারতীয় মাদকের আগ্রাসন রয়েছে। তেঁতুলিয়া পাইলট স্কুলের একজন শিক্ষক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, স্কুলের ছাত্ররাও মাদকে জড়িয়ে পড়ছে।

গুলি চালানোর অনুমতি নেই বিডিআরের

সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বিডিআরের বর্তমানে গুলি করার কোনো অনুমোদন নেই। বাংলাদেশের ভূমি বিএসএফ দখল করে নিলেও বিডিআর গুলি করতে পারে না। অপরদিকে সীমান্তে জিরো পয়েন্টে বাংলাদেশের জমিতে কাজ করতে গেলেও বিএসএফ বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করছে। চলতি মাসে বিএসএফের সহযোগিতায় সিলেটের তামাবিল সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ারা জমি দখলে নেয়ার সময় বিডিআর গুলি করার অনুমোদন পায়নি। সিলেটের জৈন্তা, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ সীমান্তে কর্মরত বিডিআর ক্যাম্পগুলোতে গিয়ে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমানে সীমান্তে তাদের গুলির অনুমোদন নেই। ভারতীয় বিএসএফ আক্রমণ করে জমিজমা দখলে নিয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিডিআরের পক্ষে একটি গুলিও চালানোর সুযোগ নেই। গুলি চালাতে হলে

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। গত ফেব্রুয়ারির আগে কোম্পানি কমান্ডারই গুলি করার অনুমোদন দিতে পারতেন। এখন আর সেই সুযোগ সেই। এমনকি মূল ভূখণ্ডের অংশ বেদখল হলেও কিছুই করার নেই তাদের।

গত ৯ আগস্ট সিলেটের তামাবিল সীমান্তে আমস্বপ্নপুর গ্রামে ভারতীয় খাসিয়ারা বিএসএফের সহযোগিতায় বাংলাদেশের জমিতে দখল নেয়। গ্রামের কৃষকদের জমি দখল করে নেয়ার সময়ও বিডিআর গুলির অনুমোদন পায়নি। তামাবিল সীমান্ত ফাঁড়ির পাশে আমস্বপ্নপুর গ্রামে ১২৭৭ নং সীমান্ত পিলারের ভেতরে ৫২ একর জমি দখলে নিয়েছে খাসিয়ারা। সম্প্রতি চলতি মাসে আরও জমি দখলে নিতে চাইলে এই সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দেয়। গত ৯ আগস্ট বিএসএফের সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় খাসিয়ারা আরও ১০ একর জমি দখলে নিতে চাইলে গ্রামের মানুষ বাধা দেয়। খবর পেয়ে তামাবিল সীমান্ত ফাঁড়ি ও পার্শ্ববর্তী শ্রীপুর সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে বিডিআর জওয়ানরা আসলে উভয় পক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিডিআর বাংলাদেশী জমি উদ্ধার করতে শক্ত অবস্থান নিয়ে জমি বরাবর লাল পতাকা লাগিয়ে করে।

এতে ভারতীয় খাসিয়া ও বিএসএফ বিডিআরকে ঘিরে ফেলে। লাল পতাকা লাগানো বাশের খুটি উঠিয়ে বিডিআর-এর কমান্ডারের প্রতি ছুড়ে মারে বিএসএফ। স্থানীয় আমস্বপ্নপুর গ্রামের মানুষ জানায়, এ সময় বিডিআর শক্ত অবস্থান নিয়ে গুলি করার জন্য অনুমোদন চায়। কিন্তু বিডিআর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় এখান থেকে পিছু হটে চলে আসে। গ্রামের সাধারণ মানুষ জানায়, তাদের সামনেই লাল পতাকাটি উপড়ে বিডিআর কমান্ডারের দিকে ছুড়ে মারে বিএসএফ। এ সময় বিডিআর অসহায়ের মতো দাঁড়িয়েছিল। তারা জানায়, অতীতে কখনও বিডিআরকে এতো অসহায় অবস্থায় দেখা যায়নি। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির পিলখানায় হত্যাকাণ্ডের পর থেকে বিডিআর অসহায় হয়ে গেছে। স্থানীয় একাধিক বিডিআর ক্যাম্পে যোগাযোগ করে জানা গেছে, বিডিআরের এখন গুলি করার কোনো অনুমোদন নেই। দেশের জমি দখলে নিয়ে গেলেও বিডিআর প্রতিপক্ষকে গুলি করতে পারবে না। এই ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন এমন একজন জওয়ান জানান, বিএসএফের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে তারা গুলি করার জন্য অনুমোদন চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই কর্তৃপক্ষ অনুমোদন দেয়নি। বিডিআর জওয়ানরা আরও বলেন, দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা করা হচ্ছে বিডিআরের প্রধান কর্তব্য। প্রয়োজনে জীবন গেলেও বিডিআর জমি রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ অনুমোন না দেয়ায় ফিরে আসতে হয়েছে। অতীতে কখনো এরকম হয়নি আমস্বপ্নপুর গ্রামের পাশে সীমান্ত এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ৫২ একর জমি দখলে নেয়ার পর বিএসএফ একটি জায়গায় একটি পোস্ট বসিয়েছে। এই পোস্টে সার্বক্ষণিক পাহারা বসিয়েছে বিএসএফ। ১৯৮২ সাল থেকে বিএসএফের সহযোগিতায় এই এলাকায় খাসিয়ারা জমি দখলে নিতে শুরু করে। ১৯৮২ সালে প্রথম জমি দখলে নিতে বিএসএফ গুলি চালালে ময়না মিয়া নামে এক কৃষক নিহত হয়। এরপর

www.pathagar.com

থেকে প্রতিবছর তাদের দখল বাড়াতে থাকে। বর্তমানে অপদখলকৃত জমির পরিমাণ ৫২ একরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চলতি মাসে আরো জমি দখলে নিয়েছে ভারতীয় খাসিয়ারা। তাদের সহযোগিতা করছে বিএসএফ। স্থানীয় অধিবাসীরা জানায় গেল সপ্তাহে দখলে নেয়ার সময় গ্রামের লোক বাধা দিতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে দুই শতাধিক বিএসএফ চলে আসে। বিডিআরকে সংবাদ দিলে মাত্র ৭ জন সেখানে উপস্থিত হয়। স্থানীয় গ্রামবাসী জানায়, ৭ জন বিডিআর প্রথমে শক্ত প্রতিবাদ করলেও পরবর্তী সময়ে ওপরের নির্দেশ আসার পর নমনীয় হয়ে যায়। তারা বলেন, বিডিআর প্রথমে শক্ত অবস্থান নিয়ে নমনীয় হয়ে যাওয়ার পেছনে রহস্য রয়েছে।

তামাবিল বিডিআর ক্যাম্পের জওয়ানরা জানায়, বিএসএফ এই এলাকার সীমান্ত পিলারও পরিদর্শন করতে দিচ্ছে না। কারণ সীমান্ত পিলারের ভেতরে বাংলাদেশের জমি তারা দখল করে রেখেছে। এজন্য সীমান্ত পিলার পর্যবেক্ষণ করতে দেয় না বিএসএফ।

নমনীয় বিডিআর : ঔদ্ধত্য বেড়েছে বিএসএফের

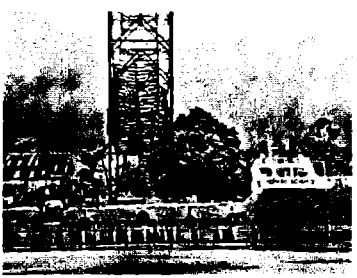

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তের নোম্যান্স ল্যান্ডের মধ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নির্বিঘ্নে নানারকমের নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে অথচ বাংলাদেশ নোম্যান্স ল্যান্ডের বাইরেও কিছু নির্মাণ করতে পারছে না। বিএসএফের বর্তমান আগ্রাসী নীতির কারণে বাংলাদেশের ভেতরে স্কুল ভবন থেকে শুরু করে অনেক রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। বিএসএফের বাধার কারণে জকিগঞ্জ পৌর এলাকায় একাধিক রাস্তার নির্মাণ আটকে গেছে। প্রকৌশলীরা জানান, নির্ধারিত সময়ে সরকারের বরাদ্দ টাকায় নির্মাণ কাজ করা না গেলে তা ফেরত যাবে। গত ২০ আগস্ট জকিগঞ্জে সরেজমিন গিয়ে এ চিত্র দেখা গেছে। সরেজমিন দেখা যায়, কনাছড়া ইউনিয়নের খাজনা গ্রামে গাগলাজুড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণেও বাধা দিয়েছে বিএসএফ। পৌরসভার কাস্টমস এলাকায় একটি যাত্রী ছাউনি নির্মাণ বিএসএফের বাধার কারণে বন্ধ রয়েছে। অতীতে কখনও বিএসএফ এসব এলাকায় কোনো নির্মাণ কাজে বাধা দেয়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় অধিবাসীরা। বর্তমানে দুর্বল সীমান্তরক্ষা নীতি ও বিডিআরের নমনীয়তার কারণেই বিএসএফ এই ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে বলে মনে করেন এলাকার সাধারণ মানুষ। অপরদিকে ভারত জকিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার জিরো পয়েন্টে নির্মাণ কাজের পাশাপাশি কাঁটাতারের বেড়াও দিচ্ছে। আটগ্রাম এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্তের একটি টিলা কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে নিয়ে গেছে। জকিগঞ্জের সীমান্তে গাগলাজুড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা

www.pathagar.com

গেছে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে। এই স্কুলে সরকারি অনুদানে তৃতীয় তলা এটি ভবন নির্মাণের জন্য পিলারের কাজ সম্পন্ন করার পর বিএসএফ এসে কাজে বাধা দেয়। কুশিয়ারা নদীতে বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে নৌকায় এসে বিএসএফ কাজ বন্ধ রাখার জন্য ধমক দেয়। অথচ একই স্থানে ২০০৬ সালেও স্কুলের একটি পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তখন কোনো বাধা দেয়নি বিএসএফ। ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে আরও একটি টিনশেড ভবন রয়েছে। এই গ্রামের ৭০ বছরের প্রবীণ আবুল কালাম জানান, বিএসএফ নদীতে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করেছে এ রকম দৃশ্য অতীতে কখনও দেখেনেনি। তিনি বলেন, জীবনে প্রথমবারের মতো দেখা গেল বিএসএফ বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে এই তীরে এসেছে। একই কথা বলেন, গ্রামের আরও প্রবীণ হাজী লিয়াকত আলীসহ অন্যরা। সবাই বলেন, তারা জীবনে কখনও দেখেননি বিএসএফ নদী অতিক্রম করে এই তীরে এসেছে। তারা সরকারের নতজানু নীতি ও বিডিআরের দুর্বলতাকেই এজন্য দায়ী করে বলেন,অতীতে বিডিআরকে খুবই সতর্ক অবস্থায় দেখা যেতো। এখন বিএসএফ যা বলছে বিআরও সেই মোতাবেক কাজ করছে।

স্কুল ভবনটি নির্মাণে ঠিকাদারী কোম্পানির পরিচালক জিল্লুর রহমান ও নাসির উদ্দিন জানান, গত ২৮ জুন বিএসএফ হঠাৎ করে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে এসব কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। পর দিন স্থানীয় নোহার মহল সীমান্ত ফাঁড়ির বিডিআর এসেও কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলে। ঠিকাদার জিল্লুর রহমান জানান, আগে সীমান্তে কখনও বিএসএফ এসব কোনো কাজে বাধা সৃষ্টি করলে বিডিআর শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলত। এবারই প্রথম বিডিআরকে খুব নমনীয় আরচণ করতে দেখা গেছে। বিএসএফ কাজ বন্ধ রাখার জন্য বলে দিয়েছে বিডিআরও তাই করেছে। তিনি জানান, বিডিআর তাকে জানিয়েছে এখানে ভবন নির্মাণে সহযোগিতা করতে গেলে গুলি নিক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু বিডিআরকে গুলি নিক্ষেপ করতে ওপরের কর্তৃপক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যে জওয়ান গুলি নিক্ষেপ করবে তার চাকরি থাকবে না বলে জানিয়ে দিয়ে বিডিআর অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলে জানান ঠিকাদার। বিডিআরের সংশ্লিষ্ট সীমান্ত ফাঁড়িতে গিয়ে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, বিএসএফ তাদের কোম্পানি সদরে চিঠি দিয়ে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করেছে। কোম্পানি সদর থেকে স্কুলটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। এই সীমান্ত ফাঁড়িতে বিডিআরের এক কর্মকর্তা জানান, বিএসএফের দাবি হচ্ছে সীমান্তে নদীর জিরো পয়েন্ট থেকে স্কুলটি দেড়শ' গজের মধ্যে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দেড়শ' গজের মধ্যে কোনো পাকা স্থাপনা নির্মাণের সুযোগ নেই। ২০০৬ সালে ভবন নির্মাণের জন্য বিএসএফ কোনো বাধা দেয়নি কিন্তু এবার বাধা দিচ্ছে কেন জানতে চাইলে বিডিআরের ওই কর্মকর্তা মুচকি হেসে চুপ থাকেন। তিনি জানান,এ স্কুলটি নির্মাণ নিয়ে বিএসএফ ও বিডিআরের মধ্যে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠক হয়েছে; কিন্তু বিএসএফ কোনো অবস্থায়ই বিল্ডিং তৈরি করতে দিতে রাজি হচ্ছে না। জকিগঞ্জ পৌরসভার

www.pathagar.com

কাস্টমস এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে একটি যাত্রী ছাউনির পিলার দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বিএসএফ বাধা দেয়ার কারণে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না। উপজেলা সদরের মাইজকান্দি এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে নদীর তীরে পাকা রাস্তা নির্মাণ বন্ধা রয়েছে। বিএসএফের বাধার কারণে নির্মাণ কাজ বন্ধ রয়েছে বলে জানান স্থানীয় অধিবাসীরা। অতীতে কখনও ওই এলাকায় নির্মাণ কাজে বাধা দেয়া হয়নি। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ভারত তাদের অংশে পাকা রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন পাকা স্থাপনা তৈরি করেছে। জকিগঞ্জের হায়দারবন এলাকার উল্টোদিকে ভারত কুশিয়ারা নদীতে বিরাট একটি জেটি নির্মাণ করেছে। এই জেটির একটি অংশ নদীর অর্ধেক অতিক্রম করে বাংলাদেশের সীমানায় চলে এসেছে। তারা নদীর তীরে পাকা রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে ওঠানামার জন্য সিঁড়িও তৈরি করেছে। নদীর ভাঙন রক্ষার জন্য ভারত তীরে পাথরের বোল্ডের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করলেও বাংলাদেশ অংশে পাথর ফেলতে দিচ্ছে না। কারহাল ইউপির চেক ও উত্তর কিলোগ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ ইতোমধ্যে নদীতে বিলীন হয়ে গেলেও কোনো বাঁধ তৈরি করতে দিচ্ছে না ভারত। এছাড়া পৌরসভায় কাচারি এলাকায় আবদুল্লাহ মিয়ার বাড়ির সামনে নদীতে ভাঙন দেখা দিলে বাঁধ দেয়ার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বিএসএফের বাধার কারণে বাঁধ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান স্থানীয় অধিবাসীরা। জকিগঞ্জ উপজেলার আটগ্রাম এলাকায় সীমান্তে বাংলাদেশ অংশের একটি টিলা বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে নিয়ে গেছ। এছাড়া নোহরমহল সীমান্ত ফাঁড়ির উল্টোদিকে ভারতীয় নোম্যান্স ল্যান্ডে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়। এ এলাকায় নোম্যান্স ল্যান্ডে অবস্থিত মসজিদ নেয়া হয় কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পের একজন জওয়ান জানান, বহুদিন থেকে বিএসএফ এখানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বিডিআরের বাধার কারণে বিএসএফ তখন বেড়া নির্মাণ করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বিডিআর বাধা না দেয়ায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখানে কাঁটাতারের বেড়া দিতে সক্ষম হয়েছে।

পাদুয়া ক্যাম্প এখনও বিএসএফের দখলে

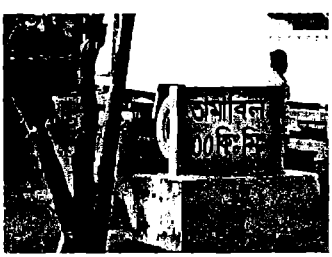

সিলেটের গোয়াইনঘাটে পাদুয়া ক্যাম্পটি দীর্ঘদিন থেকে ভারত দখল করে রেখেছে। ২০০১ সালে বিডিআর এই ক্যাম্পের দখল পুনরুদ্ধার করলেও শেষ পর্যন্ত সরকারের উচ্চ-পর্যায়ের সিদ্ধান্তে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। পাদুয়ার বিশাল এলাকা ১৯৭১ সাল থেকে ভারত অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। এছাড়াও গোয়াইনঘাট এবং জৈন্তাপুর উপজেলা সীমান্তে ৫টি সীমান্ত পিলার ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করতে দিচ্ছে না। এই সীমান্ত পিলারগুলো অতিক্রম করে ভারত বাংলাদেশের জমি দখল করে

www.pathagar.com

রাখায় সীমান্ত পিলারের কাছে কেউ যেতে পারে না। সিলেটের গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর সীমান্ত এলাকা ঘুরে স্থানীয় অধিবাসী এবং বিডিআর ক্যাম্পগুলোর জওয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় এ তথ্য জানা গেছে। বিডিআর। ক্যাম্পগুলোয় জওয়ানরা জানায়, ১২৭৭, ১২৭৯, ১২৮২, ১২৮৩ ও ১২৮৪ নম্বর সীমান্ত পিলার অতিক্রম করে ভারত বাংলাদেশের ভেতরে জমি দখল করে রেখেছে। এজন্য কখনও সীমান্ত পিলার পরিদর্শন করতে দেয় না বিএসএফ। এমনকি গোয়াইনঘাট ও ঝৈন্তাপুর সীমান্তে আমস্বপ্নপুরে ১২৭৭ নম্বর, নলজুড়িতে ১২৭৯ নম্বর, আমকি নদীর বাঁধের পাশে নলহংকে ১২৮২ নম্বর, আমজামপাড়ায় ১২৮৩ নম্বর ও মুক্তারপুরে ১২৮৪ নম্বর পিলার অতিক্রম করে বিএসএফ নোম্যান্সল্যান্ডে পর্যবেক্ষণ চৌকি বসিয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে বিএসএফের সহযোগিতায় স্থানীয় ভারতীয়রা এসব অপদখলীয় জমিতে চাষাবাদ করছে। আমস্বপ্নপুর ১২৭৭ নম্বর পিলার অতিক্রম করে বিএসএফের তৈরি করা সীমান্ত পর্যবেক্ষণ চৌকিটি বাংলাদেশের মালিকানাধীন অপদখলীয় জমিতে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, জোরপূর্বক এই জমি দখলে নেয়ার পর বিএসএফ পাহারা বসিয়েছে।

সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পতাকা বৈঠকে সীমান্ত পিলারগুলো যৌথ পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত অনেকবারই হয়েছে। তবে বিএসএফ-এর অনীহার কারণে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় না। বৈঠকের পর বিএসএফের বাধার কারণে উল্লিখিত সীমানা পিলারগুলো পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সীমান্ত এলাকাগুলেতে গিয়ে দেখা গেছে, ভারতীয় বিএসএফের ক্যাম্পগুলো নোম্যান্সল্যান্ড ঘেঁষে অবস্থিত। অপরদিকে বিডিআরের ক্যাম্পগুলো নোম্যান্সল্যান্ড থেকে এক কিলোমিটারের বেশি ভেতরে। এছাড়া বিডিআরের একটি বিওপির (সীমান্ত পর্যবেক্ণ ক্যাম্প) বিপরীতে বিএসএফের ৩ থেকে ৫টি পর্যন্ত বিওপি রয়েছে। কানাইঘাটের লোবাছাড়া বিওপির বিপরীতে বিএসএফের লাইলং, লাইজুড়ি, কুলিয়ান, উকিয়া ও ডাপা-এ ৫টি বিওপি অবস্থিত। এসব বিওপির ফাঁকে ফাঁকে দেড় থেকে দুইশ' গজ অন্তর বিএসএফের পর্যবেক্ষণ পোস্ট রয়েছে। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ পোস্টে ৩-৪ জন করে বিএসএফ সার্বক্ষণিক পাহারা দেয়। অপরদিকে ডানে-বাঁয়ে বিডিআরের এক ক্যাম্প থেকে অপর ক্যাম্পের দূরত্ব হচ্ছে ২০ কিলোমিটার। দুর্গম এই এলাকায় কাদাপানিতে হেঁটে বিডিআরকে টহল দিতে হয়। অথচ জৈন্তা ও খাসিয়া পাহাড়ি টিলায়ও বিএসএফের টহলের জন্য পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছে ভারত। তামাবিল সীমান্ত ফাঁড়িতে গিয়ে দেখা গেছে তাদের বিপরীতেও ভারতের বিএসএফ-নং ৫টি বিওপি রয়েছে। এই বিওপিগুলো হচ্ছে ডাউকি, লাখান, নালকিং, নলহংক ও নলজুড়ি।

গোয়াইনঘাটের জাফলং সীমান্ত এলাকায় পিয়াইন নদী পার হয়ে বাংলাদেশী খাসিয়াদের নকশিয়াপুঞ্জি। নকশিয়াপুঞ্জি ঘেঁষেই ভারতের মেঘালয়ের সীমান্ত। নকশিয়াপুঞ্জি পার হয়ে প্রতাপপুর সীমান্ত ফাঁড়ি। এই ফাঁড়ির পরেই পাদুয়া।

www.pathagar.com

স্থানীয় অধিবাসী ও বিডিআর জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করতে এসে বিএসএফ পাদুয়া ক্যাম্পে অবস্থান নিয়েছিল। স্বাধীনতার পর বিএসএফ আর এই ক্যাম্প ও এলাকাটির দখল ছেড়ে যায়নি। ২০০১ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ৪০ বিডিআর জওয়ান এক অভিযান চালিয়ে পাদুয়া ক্যাম্পটি উদ্ধার করেছিল। দখলে নিয়েছিল বিডিআর। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্তের পর পাদুয়া ছেড়ে চলে আসে বিডিআর। বিএসএফ আবারও পাদুয়া ক্যাম্পের দখল নেয়। এরপর থেকে বিএসএফ এই এলাকায় সার্বক্ষণিক সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে জানান স্থানীয় অধিবাসী। অপরদিকে পাদুয়ার পাশে প্রতাপপুর বিডিআর ক্যাম্পে গিয়ে দেখা গেছে ঢিলেঢালাভাব। ক্যাম্পের গেটের পাশে সার্বক্ষণিক পাহারা থাকার নিয়ম থাকলেও ১৯ আগস্ট বিকেলে ক্যাম্পের কাউকে ডিওটিতে দেখা যায়নি। ক্যাম্পের সামনের রাস্তায় সাদা পোশাকে লুঙ্গি পড়া ক্যাম্প কমান্ডার দাঁড়িয়েছিলেন। তার সঙ্গে কথা বলে পাদুয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই সীমান্তে কোনোরকমের সমস্যা নেই। এই সীমান্ত শান্ত আছে। তিনি আরো বলেন পাদুয়া এখন আর আমাদের নয়। সেখানে বরং বাংলাদেশী লোকজন গিয়ে তাদের উৎপাত করে।

ইমিগ্রেশন অফিসে সোলার সেল স্থাপনেও বিএসএফের বাধা

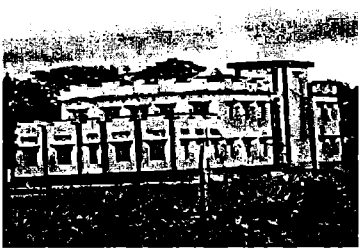

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া সীমান্তে চাতলাপুর স্থলবন্দরে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কার্যালয়ে বিদ্যুতের জন্য সোলার প্যানেল স্থাপনেও বাধা দিচ্ছে বিএসএফ। চাতলাপুরের পাশেই তেলিবিল এলাকায় মনো নদীর ভাঙন রোধে ব্লকও ফেলতে দিচ্ছে না বিএসএফ। অথচ এ বন্দরের পাশেই চাঁনপুর ও ভৌলাপাশায় জিরো লাইনের দেড়শ' গজের মধ্যে বিএসএফের ৩টি ক্যাম্প রয়েছে। এই ক্যাম্পগুলোর আওতায় কয়েকটি পর্যবেক্ষণ পোস্টও রয়েছে জিরো লাইনের দেড়শ' গজের ভেতরে। এছাড়া বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন অফিসের উল্টাদিকে উত্তর ত্রিপুরার একটি সরকারি ভবন রয়েছে জিরো লাইনের দেড়শ' গজের মধ্যে। আন্তর্জাতিক সীমানা আইন অনুযায়ী মূল সীমান্ত পিলার থেকে দেড়শ' গজের মধ্যে কোনো দেশেরই স্থায়ী স্থাপনা বা সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফাঁড়ি স্থাপনের কথা নয়। স্থানীয় অধিবাসীরা জানায় জিরো লাইনের দেড়শ' গজের ভেতরে অবস্থিত এসব ক্যাম্প থেকে রাতে বিএসএফ মূল সীমানা পিলার অতিক্রম করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অপরদিকে বিডিআরের ক্যাম্পগুলো জিরো লাইন থেকে আধা কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত।

মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় সরেজমিনে এসব চিত্র দেখা গেছে। মৌলভীবাজারের চাতলা চা বাগানের ভেতরে নমৌজা তিন দিক থেকে

www.pathagar.com

ভারত সীমান্ত বেষ্টিত। একদিকে মনো নদী অতিক্রম করে নমৌজায় যেতে হয় বিডিআরকে। এখানে যেতেও বিডিআরের জন্য কোনো নির্ধারিত নৌকা নেই। মনো নদীর কারণে নমৌজা এলাকাটি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। ভারতীয় ফেনসিডিল ও হেরোইনের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় জায়গাটি। কুলাউড়ার চাতলাপুর স্থলবন্দরে গিয়ে দেখা যায় ইমিগ্রেশন অফিসে বিদ্যুৎ নেই। পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর জানান, ১৬ আগস্ট ইমিগ্রেশন অফিসের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বিএসএফ তাতে বাধা দেয়। এ নিয়ে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে ১৭ আগস্ট একটি পতাকা বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। সর্বশেষ ১৪ রাইফেলস ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের পক্ষ থেকে একটি চিঠি দেয়া হয়েছিল। গতকাল পর্যন্ত এই চিঠির কোনো জবাব দেয়নি বিএসএফ। পুলিশের ওই এসআই জানান, সোলার প্যানেল স্থাপনের সময় বিএসএফ এসে বলে, এটা নোম্যান্স ল্যান্ড। এখানে কোনো কিছু স্থাপন করা যাবে না। তিনি জানান, বিদ্যুতের অভাবে তাদের নিজস্ব যোগাযোগের ওয়্যারলেস সেটাও বসানো যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ না থাকায় রাতে ইমিগ্রেশন অফিস সংলগ্ন এলাকায় ভুঁতুড়ে অন্ধকার নেমে আসে। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জিরো লাইনের কাছে গেলেই বিএসএফ ধরে নিয়ে যায়। সম্প্রতি চাতলাপুর চা বাগানের মহেশ বাউরি ও মনোরঞ্জন বাউরি নামের দুই শ্রমিক লাকড়ি কাটতে জিরো লাইনের কাছে গেলে বিএসএফ তাদের ধরে নিয়ে যায়। বিডিআরের পক্ষ থেকে তখন পতাকা বৈঠক করে তাদের ফেরত আনতে চাইলেও বিএসএফ কোনো সাড়া দেয়নি। অবশেষে ৩ মাস ভারতের জেলে থাকার পর গত সপ্তাহে তাদের মুক্তি দিয়ে বিডিআরের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

চাতলাপুর স্থলবন্দরের কাছে শরীফপুর বিডিআর ক্যাম্প কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করে ইমিগ্রেশন কার্যালয় সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে বিএসএফের বাধা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই ক্যাম্প এ বিষয়ে কিছুই জানে না। রাতে এ এলাকায় বিএসএফ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ বিষয়েও তার কিছুই জানা নেই।

কুলাউড়ার তেলিবিল এলাকায় মনো নদীর ভাঙন রোধে তৈরি করা হয়েছিল সিসি ব্লক। কিন্তু বিএসএফের বাধার কারণে এ এলাকায় নদীভাঙন ঠেকাতে ব্লকও ফেলতে পারছে না বলে জানায় স্থানীয় অধিবাসীরা। স্থানীয় বিডিআর ক্যাম্পও বিএসএফের বাধার কথা স্বীকার করে। এতে নদী প্রতিদিন ভেঙে তেলিবিল এলাকার আয়তন ছোট হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে একটু দূরেই ভারতের দিকে চর জেগে ওঠায় তাদের সীমান্ত এলাকা প্রশস্ত হচ্ছে। বিডিআর ক্যাম্পগুলোর কমান্ডাররা জানান, নদীর তীর রক্ষার ব্লক ফেলতে গেলে সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। এ মুহূর্তে সীমান্তে যাতে কোনোরকমের উত্তেজনা দেখা না দেয়, এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ রয়েছে বলে জানান ক্যাম্প কমান্ডার।

www.pathagar.com

বাল্লায় জমি দখলসহ নানা বাড়াবাড়ি বিএসএফের

হবিগঞ্জের বাল্লা সীমান্তে খোয়াই নদীর ভাঙনরোধে তৈরি করা সিসি ব্লক ফেলতে দিচ্ছে না বিএসএফ। গত ৪ মাস যাবত ২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি সিসি ব্লক অকেজো পড়ে আছে। পাশাপাশি নদীর তীরে মোকাম ঘাট এলাকায় ১৪০ বিঘা জমি বিএসএফ দখল করে রেখেছে। এই সীমানায় অমীমাংসিত জায়গায় দেড়শ' গজের ভেতরেই কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য বিএসএফ অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় আজমপুর সীমান্তেও বিএসএফ বিরোধপূর্ণ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জেলার কসবা এলাকার অনেক জায়গায় সীমান্ত পিলার ঘেঁষে নোম্যান্স ল্যান্ডে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে ভারত।

হবিগঞ্জের বাল্লা, মাধবপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া ও কসবা সীমান্তে সরজমিনে গিয়ে এ চিত্র দেখা গেছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা ও মাধবপুর উপজেলার সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। পাহাড়ি ও সমতল এলাকাজুড়ে সীমান্ত। রঘুনন্দন পাহাড়ের দুর্গম এলাকাগুলোতে বিডিআরের সীমান্ত ফাঁড়িগুলোতে যাতায়াতের কোনো সুব্যবস্থা নেই। বিডিয়ারকে পাহাড়ের মধ্যেই পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল পাহারা দিতে হয়। সংশ্লিষ্ট বিওপিগুলোতে আলাপে জানা গেছে, ভারতীয় বিএসএফের আধুনিক অস্ত্রের বিপরীতে মর্টার, মেশিনগান, চাইনিজ রাইফেল, এলএমজি ও এসএমজি হচ্ছে বিডিআরের ভরসা। সীমান্ত পাহারায় বিডিআরের বিওপিগুলোতে প্রাথমিক মোকাবিলার জন্য এ অস্ত্র ছাড়া অন্যকোনো অস্ত্র নেই। বিডিআর নিয়মিত টহলের জন্য শুধু রাইফেল সঙ্গে রাখতে পারে। হঠাৎ করে আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য গুলি করতেও ওপরের অনুমোদন ছাড়া গুলি ছোড়ার কোনো সুযোগ তাদের নেই। বাকি অস্ত্রগুলো বিডিআরের নিয়ন্ত্রণ নেই। ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারির পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর বিডিআরের ভারি অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ পুলিশের হাতে।

এপ্রসঙ্গে মাধবপুর উপজেলার সীমান্ত একটি বিডিআর ক্যাম্প কমান্ডার বলেন, আক্রান্ত হয়ে মরে গেলেও এখন বিডিআর গুলি করতে পারবে না।

বাল্লা সীমান্তের ১৯৬৪ নং পিলার বরাবর ভারতের খোয়াই শহরের কাছে দেড়শ' গজের মধ্যে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে এলাকায় বিএসএফের অপতৎপরতা বেড়ে গেছে। বিপরীতে বিডিআরের আগের জৌলুস ও সাহস নেই। বিডিআর নিয়মিত টহল দিলেও আগের মতো শক্ত অবস্থানে নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান বিডিআরের নমনীয়তার কারণে খোয়াই নদীর

www.pathagar.com

তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটি ভেস্তে যাচ্ছে। বিডিআর শক্ত অবস্থানে না থাকায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা সিসি ব্লক অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। গত মে মাসে চুনারুঘাটের বাল্লা সীমান্তের টেকারঘাট এলাকায় খোয়াই নদীর ভাঙন প্রতিরোধ ও তীর সংরক্ষণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ টাকায় তৈরি সিসি ব্লক এখন পানি উন্নয়ন বোর্ডের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএসএফ ব্লক ফেলায় বাধা দেয়ার পর থেকে কাজ বন্ধ রয়েছে। এ নিয়ে বিএসএফ-বিডিআরের মধ্যে পতাকা বৈঠক হলেও কোনো অগ্রগতি নেই। নিজেদের এলাকায় নদীভাঙন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না বিএসএফের বাধার কারণে।

বাল্লা সীমান্তে ৩টি বিডিআর ফাঁড়ির অধীনে ২৮ কিলোমিটার এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে ২৬ কিলোমিটারই হচ্ছে পাহাড়ি এলাকা। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বিডিআর জওয়ানরা বিশুদ্ধ পানির অভাব থেকে শুরু করে নানা সমস্যায় রয়েছে। পাহাড় অতিক্রম করে উপজেলা সদরে আসতে হলে ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হাটতে হয়। পায়ে হাঁটা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বিডিআরের। বাল্লা সীমান্তের কালেঙ্গা, রেমা ও বাল্লা–এই ৩টি বিডিআর ক্যাম্পে মাত্র ৬২ জওয়ান রয়েছেন। অপরদিকে এই বিডিআর ক্যাম্পগুলোর বিপরীতে ভারতের রয়েছে ৭টি বিএসএফ ক্যাম্প। জনবলও বিডিআরের ৩ গুণের চেয়ে বেশি।

এ এলাকার বিডিআর জওয়ানরা জানান, ৭টি বিএসএফ ক্যাম্পের মধ্যে রয়েছে সিংগিছড়, প্রহড়মুড়া, বনবাজার, তুলশীবাড়ি, গুমগুমবস্তী, বাছাইবাড়ী ও বড়বাগাই। বিএসএফের এ ক্যাম্পগুলোতে ইসরাইলের তৈরি আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ রয়েছে। পরবর্তীতে বিডিআরের মর্টার, মেশিনগান, চাইনিজ রাইফেল, এলএমজি ও এসএমজি ছাড়া কিছুই নেই। সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিলে ব্যাটালিয়নের সহযোগিতা পৌঁছতে ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় তাদের লড়াই করে টিকে থাকতে হবে। ব্যাটালিয়ান থেকে তাদের ক্যাম্পে পৌঁছাতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টার বেশি। তারপরই কেবল ব্যাটালিয়নের সহযোগিতা পৌঁছতে পারে। মাধবপুরের ৩২ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকার জন্য রয়েছে ৬পি বিওপি। এই বিওপিগুলোর বিডিআরের সীমান্ত টহলের জন্য পায়ে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। অন্যান্য এলাকার মতো এখানে শুধু কোম্পানি সদরের জন্য একটি পুরনো মোটরসাইকেল রয়েছে।

এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় সীমান্ত পিলার ঘেঁষে ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে। সীমান্ত পিলারের মাত্র কয়েক গজের মধ্যে ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে। আখাউড়ায় আজমপুরে ২০২৩ নং সীমান্ত পিলার থেকে শুরু করে ৮, ৯ ও ১০নং এস সাবপিলারে অমীমাংসিত সীমানায় ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিএসএফের এই তৎপরতা আরও বেড়ে গেছে।

স্থানীয় অধিবাসীরা জানায় এই এলাকার সীমান্ত নিয়ে বিরোধের কারণে অতীতে কখনো বেড়া দিতে আসেনি বিএসএফ। এখন তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

আখাউড়ার আজমপুর সীমান্ত ফাঁড়ির জওয়ানরা জানান, এখানে ২০২৩ নং সীমানা পিলারের কাছে বিএসএফ বিরোধপূর্ণ জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিডিআরের শক্ত প্রতিরোধের কারণে এখনও এখানে বেড়া নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

এদিকে আজমপুর সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে কয়েকশ' গজ দূরেই রয়েছে আগরতলার ঊষাবাজার বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরের ফ্লাইজোন হচ্ছে বাংলাদেশের আকাশ সীমানা। বাংলাদেশের আকাশ সীমানা ব্যবহার করেই এখানে বিমান উঠা-নামা করে।

কসবায় রেল স্টেশনের পেছনেই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত। এখানে সীমান্ত পিলার ঘেঁষেই ভারত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া, আজমপুর ও কসবা সীমান্ত ভারতীয় মরণনেশা ফেনসিডিলের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে দাবি করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। সংঘবদ্ধ চোরাচালানিরা এই এলাকা দিয়ে ফেনসিডিল নিয়ে আসে। আখাউড়া, আজমপুর ও কসবা রেল স্টেশন এবং বাস রোডে ফেনসিডিল দেশের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছানো হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করেন, ফেনসিডিল চোরাচালানের সঙ্গে পুলিশ, বিডিআর ও র‍্যাবের একটি চক্র জড়িত রয়েছে। লাইনম্যানের মাধ্যমে নিয়মিত মাসোহারা উঠায় এই ৩টি বাহিনীর সংঘবদ্ধ একটি চক্র। এলাকাবাসীর মতে, ফেনসিডিলই হচ্ছে এই এলাকার প্রধান সমস্যা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা সদর থেকে শুরু করে আশপাশের এলাকা থেকেও যুবকরা আসে ফেনসিডিল সেবন করতে। দিনে দুপুরে কসবা ও আখাউড়ায় ফেনসিডিলের বেচাকেনা হতে দেখা গেছে।

সীমান্তজুড়ে ভারতীয় ফেনসিডিলের আগ্রাসন

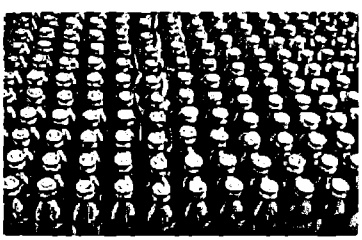

সারাদেশের সীমান্ত এলাকা দিয়েই ঢুকছে ভারতীয় ফেনসিডিল। ফেনসিডিলের আগ্রাসনে নেশায় আসক্ত হচ্ছে দেশের যুবসমাজ। সীমান্তে ফেনসিডিল প্রবেশ ঠেকাতে পারছে না বিডিআর। দেশের ভেতরে ঢোকার পর রাস্তা বা বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে যা আটক করা হয় তা মূল চালানের অতি সামান্য। সংশ্লিষ্ট ও বিডিআর জওয়ান এবং নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে বর্তমানে চোরাচালানির প্রধান পণ্য হচ্ছে ফেনসিডিল। বাংলাদেশের বাজার ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সীমান্তের ওপারে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফেনসিডিলের কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় উৎপাদিত ফেনসিডিল বাংলাদেশের ভেতরে পাচার করতে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে দিয়ে সহযোগিতা করে।

www.pathagar.com

বিডিআরের একটি বিওপি থেকে আরেকটি বিওপির দূরত্ব ১০ মাইলের বেশি হওয়ায় পুরো সীমান্ত ফাঁকা থাকে। বিডিআর পায়ে হেঁটে একদিকে টহলে গেলে আরেক দিক দিয়ে অবাধে প্রবেশ করে ফেনসিডিল। চোরাচালানি নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িতরা বিডিআরের অবস্থান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সার্বক্ষণিক অবহিত করে। যেসব এলাকায় নৌসীমান্ত রয়েছে, সেখান দিয়ে ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য প্রবেশ করে। কুড়িগ্রামের রৌমারী, রাজীবপুর, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, রাজশাহীর গোদাগাড়ী, মৌলভীবাজারে মনো, সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা, হবিগঞ্জের খোয়াইসহ দেশের যেসব এলাকায় নদীপথে সীমান্ত রয়েছে, সেখানে ফেনসিডিল ও মাদকের প্রবেশ বেশি ঘটে বলে জানায় বিডিআর জওয়ান ও স্থানীয় বাসিন্দারা। গত ২৮ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত পঞ্চগড়, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা ঘুরে ফেনসিডিল পাচারের ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে। এই জেলাগুলোর সীমান্তের এমন কোনো এলাকা খুঁজে পাওয়া যায়নি, যেখানে ফেনসিডিল নেই। এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সীমান্ত পাহারায় কর্মরত বিডিআর জওয়ানরাও। ভারতীয় বিএসএফের সহযোগিতায় কোথাও দুই স্তর, কোথাও ৩ স্তরের কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নানা কৌশলে দেশে ঢুকছে ফেনসিডিল। বিডিআর জওয়ানরা বলেন, সীমান্তজুড়ে ভারতের কাঁটাতারের কঠিন বেড়া একটি সাপের পক্ষেও অতিক্রম করা সম্ভব হবে না; তারপরও কিন্তু ফেনসিডিল আসছে। এটা যেন অলৌকিক ব্যাপার বিডিআর জওয়ানরা জানান, চোরাচালানিদের একটি কৌশল ঠেকিয়ে দেয়ার পর তারা নতুন কৌশল গ্রহণ করে। এভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে চোরাচালানিরা কৌশল পাল্টায়। বোতলজাত ফেনসিডিলের পাশাপাশি ড্রামে ভর্তি করেও ফেনসিডিল আসে।

সীমান্ত এলাকায় ফেনসিডিল পাচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, শুধু ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ২১টি, আগড়তলায় ৪টি, মেঘালয়ে ৩টি, আসামের সীমান্তে ৫টি ফেনসিডিলের কারখানা রয়েছে। বাংলাদেশের বাজারকে কেন্দ্র করেই এসব ফেনসিডিলের কারখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও কলকাতায় ৪৭ সাউথ রোড, ৫নং পিটারটেন, ৬২ইউ তিলজালা রোড, ৫১ ইকবালপুর রোড, ৩১/১ উত্তর তাপসিয়া রোড,মেহতা বিল্ডিং,পোদ্দার কোর্ট এলাকায় ফেনসিডিলের কারখানা রয়েছে বলে জানায় সংশ্লিষ্ট সূত্র। ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি এলাকায়ও ফেনসিডিলের কারখানা রয়েছে। বিভিন্ন সীমান্তে বিডিআর ক্যাম্পগুলোতে আলাপ করে জানা গেছে প্রত্যেকটি ক্যাম্প প্রতিদিন ফেনসিডিল আটক করছে এবং মামলা দায়ের করছে। এমন কোনো দিন নেই বিডিআর জওয়ানরা ফেনসিডিল আটক করছে না। তারপরও দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে ফেনসিডিল। দিনাজপুরের হিলিতে প্রকাশ্যেই ফেনসিডিল নিয়ে সীমান্ত পার হতে দেখা গেছে। লালমনিরহাটের মোগলহাট সীমান্তে বিডিআর সদস্য জানান, এখানে পরিত্যক্ত রেলস্টেশনে ফেনসিডিলের ব্যবসা চলে। সীমান্তের জিরো লাইনের মধ্যে অবস্থিত একটি ভারতীয় ছোটগ্রাম এখানে ফেনসিডিলের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে জানান বিডিআর জওয়ানরা। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে বাংলাদেশের ভেতরে ভারতীয় ছিটমহল ফেনসিডিলের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে জানান ছিটমহলটির অধিবাসীরা। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা ফেনসিডিল

www.pathagar.com

প্রকাশ্যে আন্তঃনগর জয়ন্তিকা, পারাবত ও উপবন ট্রেনে করে ঢাকায় যায় বলে জানান স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা। সিলেটের জৈন্তা সীমান্তে জাফলং এলাকায় প্রকাশ্যে ফেনসিডিল বেচাকেনা চলে। এ এলাকায় ভারতীয় জৈন্তা পাহাড় হয়ে ফেনসিডিল দেশে প্রবেশ করে। জকিগঞ্জে কুশিয়ারা নদী ফেনসিডিলের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কুড়িগ্রামের বাজবিপুর, রৌমারী, ফুলবাড়ী ও ভূরুঙ্গামারী, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, হাতিবান্দা সীমান্তের লোকজন জানান, এ এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। ভারতীয় ফেনসিডিল চোরাচালান হচ্ছে এখানকার প্রধান শিল্প। এলাকার ছোট-বড় নারী-পুরুষ সবাই ফেনসিডিল চোরাচালানের সাথে জড়িত। সব এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভারতীয় বিএসএফ সীমান্ত অতিক্রম করতে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশের পর বিডিআরের একশ্রেণীর অসাধু জওয়ান, পুলিশ, র‍্যাব, স্থানীয় প্রভাবশালী এবং সরকারি দলের লোকরা ফেনসিডিল বিপণনে সহযোগিতা করে। এজন্য বিডিআর, পুলিশ, র‍্যাব ও স্থানীয় প্রভাবশালী এবং সরকারদলীয় প্রভাবশালীদের লাইনম্যান রয়েছে। যারা ফেনসিডিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা আদায় করে নেয়। সব এলাকার স্থানীয়রা জানান, প্রশাসন ও সরকারি দলের প্রভাবশালীদের সহযোগিতা ছাড়া কারও পক্ষে ফেনসিডিল নিয়ে আসা সম্ভব হলেও বিপণন সম্ভব হবে না। বিপণন সম্ভব হয় স্থানীয় প্রশাসন ও প্রভাবশালীদের সহযোগিতায়।

বিডিআর জওয়ান ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ফেনসিডিল দেশে প্রবেশের পর সীমান্ত থেকে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে বাহন হিসেবে রেলগাড়ি, সড়ক পথে বিলাস বহুল বাস, অ্যাম্বুলেন্স এমনকি সংবাদপত্রের স্টিকার লাগানো গাড়িও ব্যবহার করা হয়। দিনাজপুরের বিরামপুর ডিগ্রি কলেজে স্থাপিত বিডিআরের অস্থায়ী ক্যাম্পের জওয়ানরা জানান, তারা সংবাদপত্রের স্টিকার লাগানো একিট গাড়ি আটক করে হাজার বোতলের বেশি ফেনসিডিল আটক করেছেন।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করছে বিএসএফ

ভারতের কাঁটাতারের বেড়ার কারণে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ বিএসএফের হাতে চলে গেছে। তারা কখন কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলছে, কখন বন্ধ করছে, এটা কারো জানা নেই। গেট খুলে যখন-তখন জিরো পয়েন্টে ভারতীয় নাগরিকদের আসার সুযোগ করে দিচ্ছে-এ বিষয়ে বিডিআরের কিছুই জানার বা করার সুযোগ নেই। এসবকিছুর পুরো নিয়ন্ত্রণ বিএসএফের হাতে। সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে এমনটাই বলছেন সাবেক বিডিআর মহাপরিচালক ও সেনাপ্রধান লে. জেনারেল আতিকুর রহমান ও সাবেক মহাপরিচালক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান। লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমান বিডিআর-এর দীর্ঘতম সময় মহাপরিচালক ছিলেন। এতো দীর্ঘ সময় আর কোনো মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনি।

তারা বলেন, বিডিআরের নাম পরিবর্তন করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, বিডিআরকে আরও উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সদস্য ও বিওপির সংখ্যা বাড়াতে হবে। তারা বলেন কোনো অবস্থায়ই আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তাকে ছোট

www.pathagar.com

করে দেখার সুযোগ নেই। সীমান্ত নিরাপত্তার সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি জড়িত।

আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, বিডিআর মানেই হচ্ছে পাদুয়া ও রৌমারীর বিজয়ী যোদ্ধা। বিডিআরের সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি বলেন,নাম পরিবর্তন না করে বরং বিডিআরকে আরও শক্তিশালী করে শত্রুদের বুঝিয়ে দিতে হবে বিডিআর ধ্বংস করে তোমরা যা করতে চেয়েছিলে তা পরনি। বিডিআরের নাম ও পোশাক পরিবর্তন করলে কয়েদির মতো অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে বলেও উল্লেখ করেন সাবেক এই বিডিআর প্রধান।

লে. জেনারেল (অব.) আতিকুর রহমান ও মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান সেনা কর্মকর্তা হিসেবে বিডিআরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আতিকুর রহমান এরশাদের শাসনামলে সেনাপ্রধান হওয়ার আগে সাড়ে ৪ বছর বিডিআরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আ ল ম ফজলুর রহমান ২০০১ সালে বিডিআরের মহাপরিচালক থাকাকালীন সিলেটের পাদুয়া ভারতের দখল থেকে উদ্ধার করেছিল বিডিআর। একই সময়ে রৌমারীতে বড়াইবাড়ী ক্যাম্প বিএসএফ দখল করতে চাইলে সম্মুখযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী সোচনীয় পরাজয় বরণ করে। সীমান্ত নিরপত্তা নিয়ে সাবেক এই দুই মহাপরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আমার দেশকে খোলামেলা সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে উঠে আসা তাদের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো।

সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল আতিকুর রহমান

সাবেক সেনাপ্রধান ও বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল আতিকুর রহমান বলেছেন, ভারত সীমান্তে যেভাবে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে, এতে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে চলে গেছে। বিএসএফ তাদের ইচ্ছামত কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে দেয় আবার ইচ্ছামত বন্ধ করে। গেট খুলে নোম্যান্সল্যান্ডে তারা কী ঠেলে দিচ্ছে সে বিষয়ে জানার কোনো সুযোগ বিডিআরের নেই। কাঁটাতারের বেড়ার মাধ্যমে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই এখন বিএসএফের হাতে। বিডিআরের পুনর্গঠনের নামে শুধু নাম ও পোশাক পরিবর্তন করে তেমন কোনো ফায়দা পাওয়া যাবে না–উল্লেখ করে সাবেক এই সেনাপ্রধান বলেন, 'পিলখানায় যে ঘটনাটি ঘটেছে, আমি এখনও বিশ্বাস করি বিডিআর নিজে এটা করতে পারে না। বাইরের ইন্ধন ছাড়া এতোবড় ঘটনা বিডিআর ঘটাতে পারে না। যারা চায় আমাদের ডিফেন্স ব্যবস্থা দুর্বল হোক তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বিডিআর চিফ হিসেবে সাড়ে ৪ বছর কাজ করেছি। তাদের কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বিডিআরের লোকরা খুবই ভালো এবং পরিশ্রমী।' তিনি বলেন, আমাদের প্রতিরক্ষার শত্রু যারা তারাই পিলখানার ঘটনাটি ঘটিয়েছে। এটা করে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। বিডিআরকে ধ্বংস করেছে, সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে মূল প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দুর্বল করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। দেশের শত্রুরা সূক্ষ্মভাবে একাজটি করতে সফল হয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন, বিডিআরের জওয়ানরা এখনও নিজেদের ইনসিকিউর মনে করছে। অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে পরস্পরে প্রতি আস্থার সঙ্কট এখনও কাটেনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান বিডিআর মহাপরিচালকও সম্প্রতি বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে আস্থার সঙ্কট কাটাতে না পারলে আগের মনোবলও সহসা ফিরে পাবে না। সবার আগে বিডিআরের জওয়ান ও অফিসারদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সাবেক এই সেনাপ্রধান জানান, বিডিআর হচ্ছে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি অংশ। এই বাহিনী যখন গঠন করা হয় তখনই চিন্তা ছিল আর্মির মতো ট্রেনিং তাদেরও দিতে হবে। সিদ্ধান্ত ছিল আর্মি অফিসাররা ট্রেনিং দেবে। এজন্য শুরু থেকেই বিডিআরের মূল নেতৃত্বে আর্মি অফিসার রাখা হয়। দেশের মূল প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিডিআর-গঠনের প্ল্যানিং থাকায় এই বাহিনীর নিজস্ব অফিসার দেয়ার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। বিডিআরের নিজস্ব ট্রেনিং স্কুল থাকলেও এখানে মূল ট্রেনিং দেয় আর্মি অফিসাররা। এ কারণেই বিডিআর যুদ্ধ কৌশলে পারদর্শী।

কেন এরকম চিন্তা করা হয়েছিল জানতে চাইলে তিনি বলেন, আর্মির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ট্রেনিং না দিলে তাদের লড়াকু চিন্তা ও মনোবল থাকবে না। বিডিআর যাতে শুধু সীমান্তের চৌকিদারি না করে প্রতিরক্ষার দায়িত্বটিও পালন করতে পারে সেই চিন্তা থেকেই এই বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। ট্রেনিংও সেরকমভাবে দেয়া হয়।

বর্তমানে বিডিআর পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা চলছে। পুনর্গঠন করতে হলে কীভাবে হওয়া উচিত জানতে চাইলে সাবেক এই সেনাপ্রধান বলেন, আগে সিদ্ধান্ত ছিল বিডিআরের দায়িত্ব শুধু সীমান্তে চৌকিদারি হবে না। সীমান্তের প্রতিরক্ষার দায়িত্বও পালন করবে। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই বিডিআরকে উন্নত সমর কৌশলের ট্রেনিং দেয়া হয়। এখনও সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিডিআর বা যে নামেই বাহিনী গঠন করা হোক, তারা কি শুধু সীমান্তে চৌকিদারি করবেন নাকি প্রতিরক্ষার দায়িত্বও পালন করবে। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হলে আর্মির মতো উন্নত ট্রেনিংয়ের দরকার আছে। উন্নত ট্রেনিং দিতে হলে আর্মি অফিসার রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিডিআরকে বর্তমান কাঠামোর বাইরে এনে রিফর্ম করতে হলে র‍্যাবের মতো বিভিন্ন বাহিনী থেকে চৌকস লোকদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। যাতে তাদের প্রমোশন হবে মূল বাহিনীতে। তখন ওই অফিসার ও সৈনিকরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে এবং তারা মনে করবে মূল বাহিনীর অংশ হিসেবে এখানে কাজ করছে।

বিডিআর নিজেদের অফিসার চায়–এ প্রসঙ্গে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জেনারেল আতিকুর রহমান বলেন বিডিআর বর্তমানে আর্মির সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেয়। একসঙ্গে কাজ করে। পুলিশ কোনো অপরাধ করলে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও শেয়ার থাকে। বিডিআরে এটা সম্ভব হয় না। কারণ আর্মির অফিসার যারা বিডিআরে কাজ করেন তারা জানেন এখানে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। তাদের মূল পদোন্নতি হবে আর্মিতে। তবে কোনো অপরাধে জড়িত হলে আর্মিতে ফিরে

www.pathagar.com

গিয়েও খারাপ অ্যাফেক্ট হবে। অপরাধের সঙ্গে জড়িত হলে পদোন্নতিসহ চাকরিতে সমস্যা হবে। তাই আর্মির যারা বিডিআরে কাজ করেন তারা যথাসম্ভব সৎ থাকার চেষ্টা করেন। বিডিআরে আর্মির নেতৃত্ব না থেকে নিজেদের অফিসার থাকলে তখন তারা নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর এতে আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই এই বাহিনীর দক্ষতার বড় সমস্যা দেখা দেবে। বর্তমানে যে স্ট্রেংথ নিয়ে বিডিআর কাজ করছে তখন সেই স্ট্রেংথ তাদের মধ্যে থাকবে না। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মতো উন্নত প্রশিক্ষণের কারণেই বিডিআর দক্ষতার সঙ্গে শক্তিশালী বিএসএফ বাহিনীর মোকাবিলায় ভালো করছে। তিনি জানান, ভারত এখন তাদের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বিএসএফ-এর ট্রেনিং দিচ্ছে। আগে সেটা ছিল না।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিডিআরের উন্নত ট্রেনিংয়ের কারণেই তুলনামূলক কম শক্তি নিয়েও বিএসএফের মোকাবিলায় কখনও পরাজিত হয়নি। সবসময় কৌশলের দিক থেকে বিএসএফকে পরাজিত করতে পেরেছে। এটার মূলে হচ্ছে বিডিআরের উন্নত প্রশিক্ষণ। তিনি বলেন, ভারতেও বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত আর্মি অফিসারদের বিএসএফে চাকরি দেয়া হচ্ছে। কারণ তাদের বিএসএফে নিজস্ব অফিসার থাকার কারণে প্রশিক্ষণ সেরকম হয় না। তাই এখন বিএসএফের অফিসার পদে অবসরপ্রাপ্ত আর্মিদের দেয়া হচ্ছে।

বর্তমানে একটি বিডিআর ক্যাম্পে মাত্র ২০ থেকে ৩০ জন সৈন্য থাকে। তাদের ১০ থেকে ২০ মাইল পর্যন্ত সীমান্ত এলাকা পাহারা দিতে হয় পায়ে হেঁটে। সড়ক যোগাযোগের অবস্থা খুবই খারাপ। এ বিষয়ে জেনারেল আতিকুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, বিডিআরের বিওপির সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত। সঙ্গে সঙ্গে বিওপিগুলোতে সেনাসংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের মতো উন্নত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা সীমান্তে রিংরোড তৈরি করেছে। আমাদের এরকম রিংরোড তৈরি করতে না পারলেও একটি বিওপি থেকে আরেকটি বিওপিতে অন্তত সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি জানান, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকার সীমান্তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। সেখানে হেলিকপ্টারের সহযোগিতা পাঠাতে হয়। সেনাদের মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে পৌঁছতে হয়। যেখানে রাস্তার যোগাযোগ খারাপ সেখানে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক এবং উন্নত করা দরকার বলেও মনে করেন সাবেক এই বিডিআর প্রধান।

চোরাচালানি প্রসঙ্গে সাবেক বিডিআর প্রধান বলেন, বর্তমানে যে আইন রয়েছে তা খুবই দুর্বল। চোরাচালানি দমনের জন্য আইনকে আরও কঠোর করতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিডিআর সারারাত জেগে একজন স্মাগলারকে ধরে থানায় হস্তান্তর করে। কিছুদিন পরই দেখা যায় ওই স্মাগলার ছাড়া পেয়ে চলে এসে বিডিআরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। এতে স্মাগলাররা আরও

www.pathagar.com

আস্কারা পেয়ে যায়। এছাড়া রাতের বেলায় কোনো স্মাগলার ধরলে প্রত্যক্ষদর্শী কোন সাক্ষী থাকে না। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছাড়া মামলায় সাজা নিশ্চিত করাও সম্ভব হয় না। আইনের এসব খুটিনাটি বিষয়গুলোকে আরও কঠোর করার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন দীর্ঘ ৩০ বছর।

সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান

বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, এই বিডিআর দিয়েই সিলেটের পাদুয়ায় ও কুড়িগ্রামের রৌমারীতে ভারতীয় বাহিনীকে পরাজিত করা হয়েছিল। পাদুয়ায় দীর্ঘ ৩০ বছর ভারতের বিএসএফের অপদখলে থাকা ক্যাম্প উদ্ধার করেছিল এই বিডিআর বাহিনী। রৌমারীতে বিএসএফ আক্রমণ চালালে বিডিআর তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিল। পাদুয়া এবং রৌমারীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতেই ভারত বিডিআরকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনাটি হচ্ছে বিডিআরকে বংস করা ও সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রের একটি অংশ। তবে বিডিআরের নাম পরিবর্তন নয়, এই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে তোমরা যা চেয়েছিলে তা পারনি।

সাবেক বিডিআর প্রধান আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, সীমান্ত আগ্রাসন ও পানি আগ্রাসন চালিয়ে ভারত আমাদের মানসিকভাবে দুর্বল করতে চায়। এটা হচ্ছে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার সুদুরপ্রসারী ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

ভারত নানাভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সম্প্রতি ভারতের কিছু সাজাপ্রাপ্ত নাগরিক বাংলাদেশের ভেতরে ধরা পড়েছে। এটাও একটি ষড়যন্ত্র। বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্রের ছাপ লাগানোর জন্যই সমঝোতার ভিত্তিতে এসব সাজাপ্রাপ্ত ভারতীয় জঙ্গিকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল। তাদের সঙ্গে সমঝোতা ছিল বাংলাদেশে এসে জঙ্গি কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে ভারত সরকার তাদের সাজা থেকে রেহাই দেবে। এই ভারতীয় নাগরিকরা উর্দুভাষী। তারা কীভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছিল–এ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা। তিনি বলেন, আরেক আহাম্মক সাবেক সচিব ওয়ালিউর রহমান আবিষ্কার করেছেন সেনাবাহিনীতে ৩০ ভাগই হচ্ছে কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। এটা আহাম্মকি ছাড়া কিছুই নয়। ওয়ালিউর রহমান জনেনই না কওমি মাদ্রাসার সার্টিফিকেটের সরকারি স্বীকৃতি নেই। এই সার্টিফিকেট দিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি নেয়ার কোন সুযোগই নেই। এই প্রচারণা চালানোর পেছনেও বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদী

www.pathagar.com

রাষ্ট্র বানানোর একরকম চক্রান্ত কাজ করেছে। বিডিআরের ঘটনা, জঙ্গি ইস্যু তৈরি করা, বর্ডারে বাংলাদেশী জমি দখল করা সবই একসূত্রে গাঁথা।

সীমান্তের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি সাবেক এই বিডিআর প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আমার দেশকে তিনি আরও বলেন, বর্তমানে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও বিডিআরকে দুর্বল করার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে সরকার হয়তো কোনো বিদেশি এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অসম সাহসী বিডিআর বাহিনীর একশ' ভাগই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। তারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। দুজন বীরশ্রেষ্ঠ রয়েছে এই বাহিনীর সদস্য। ২১৩ বছরের ঐতিহ্য রয়েছে এই বাহিনীর। বর্তমান কার্যক্রম এই সাহসী বিডিআর বাহিনীকে ধ্বংস করারই এক অশুভ চক্রান্ত। তিনি বিডিআরের মহাপরিচালক থাকাকালীন পাদুয়া ক্যাম্প পুনরুদ্ধারের পর ছেড়ে দেয়া হলো কেন–জানতে চাইলে আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, আমরা ভারতের সঙ্গে অলআউট যুদ্ধ চাইনি। পাদুয়া বাংলাদেশের ভূমিতে অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ক্যাম্পটি মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করতেন। পরবর্তী সময়ে আমাদের সাহায্যের নামে ভারতীয় বাহিনী এই ক্যাম্প ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতীয় বিএসএফ পাদুয়া ক্যাম্পটি ছেড়ে যায়নি। অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিল। ২০০১সালে দেশপ্রেমিক সাহসী বিডিআর জওয়ানরা এই ক্যাম্পটি পুনরুদ্ধার করেছিল। এই পুনরুদ্ধারের পর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ভারত স্বীকার করেছে এটি বাংলাদেশের অংশ। এই ক্যাম্প বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এর আগে তারা এই স্বীকৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও দেয়নি। পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে ক্যাম্পটি ছেড়ে চলে আসার নির্দেশ দেয়। তিনি জানান, দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়নের সময় এই ক্যাম্পের বিষয়ে দুই দেশের সরকার সিদ্ধান্ত নেবে-এই চুক্তি হয়। এটাও একটি বড় অর্জন।

তিনি বলেন, পাদুয়া পুনরুদ্ধার ও রৌমারীর বড়াইবাড়ীতে বিএসএফকে উচিত শিক্ষা দিয়ে বিডিআর প্রমাণ করেছে জাতি হিসেবে আমরা ভারতের মতো বড় শক্তিকেও পরাজিত করতে পারি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পিলখানায় বিডিআরের সদর দফতরে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ৫৭জন সেনা অফিসারকে আমরা হারিয়েছি। এই ৫৭ জন অফিসার হারানোর দুঃখ কখনও ভোলা যাবে না। সেনা অফিসাররা ছিলেন অমূল্য সম্পদ। এটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই শোকে বিডিআরকে ধ্বংস না করে বরং আরও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। তিনি বলেন, এই ঘটনার মাধ্যমে বিডিআর ধ্বংস হয়ে গেছে, আর্মি দুর্বল হয়েছে এটা আমি মনে করি না। এটা ভারতীয় এজেন্টদের প্রপাগান্ডা।

বিডিআরের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন, নাম পরিবর্তন করে আমাদের কী অর্জন হবে। বঙ্গবন্ধু বিডিআরের নামকরণ করেছিলেন। তারই কন্যা হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই নাম পরিবর্তন করবে বলে বিশ্বাস

www.pathagar.com

করি না। তিনি বলেন, বিডিআরের গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি। বিডিআর বলতে আমরা মনে করি পাদুয়ার বিজয়ী বীর, রৌমারীর অসীম সাহসী যোদ্ধা। নাম পরিবর্তন হলে মনোবল আরো দুর্বল হবে–উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিডিআরের নাম ও পোশাক পরিবর্তন করে দিলে কয়েদির মতো মনে হবে। সাধারণ নাগরিকরাও কাপড়ের তৈরি পোশাক পরে। কয়েদিরাও কাপড়ের তৈরি পোশাক পরে। তবে কয়েদির পোশাকটি গায়ে পরিধান করানো হয় অপরাধী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করার জন্য। কয়েদির পোশাক দেখলেই মনে করা হয় এই লোকটি অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত। বিডিআরকে নাম ও পোশাক পরিবর্তন করে দিলে তাদের মনে করা হবে অপরাধী। অপরাধী হিসেবে তাদের এই নাম ও পোশাক দেয়া হয়েছে। মানুষ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে, তোমরা অপরাধ করেছিলে বলেই এই নাম ও পোশাক দেয়া হয়েছে। এতে বিডিআরের মনোবল আরও ছোট হয়ে যাবে।

বিডিআরের অস্ত্র পুলিশ হেফাজতে এবং সীমান্তে জমি দখল হলেও গুলি চালানোর অনুমতি মেলে না–এ প্রসঙ্গে সাবেক বিডিআর মহাপরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমি মনে করি বিডিআরের অস্ত্র ইমিডিয়েটলি ফেরত দেয়া উচিত। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, বিডিআরের অস্ত্র নিয়ে যারা সন্দেহ পোষণ করে তাদেরই বরং মনোবল দুর্বল হয়েছে। বিডিআরের নাম পরিবর্তন ও পোশাক পরিবর্তনের চিন্তা মাথা থেকে ফেলতে হবে। এতে শত্রুদেরও একটি মেসেজ দেয়া যাবে যে, তোমরা যা করতে চেয়েছিলে তা করতে পারনি।

বর্তমানে বিওপিগুলোর দূরত্ব ও টহলে বিডিআরের পরিশ্রমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, বিওপি ১০ মাইলের বেশি দূরত্বে হওয়া উচিত নয়। এছাড়া প্রতিটি বিওপিতে একটি করে পিকআপ অথবা অন্য কোনো গাড়ি দেয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

বিওপিগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়, গাড়ি দিলে লাভ কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মহাপরিচালক থাকাকালীন বিওপিগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরির জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীকে নিয়ে সীমান্তের রাস্তার জন্য একটি ম্যাপ তৈরি করা হয়েছিল। একটি বিওপি থেকে আরেকটি বিওপিতে যাতে সহজে যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা যায় এটাই ছিল মূল লক্ষ্য। এই ম্যাপের অংশ হিসেবেই সুনামগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ১৯৮ কিলোমিটার সীমান্ত রাস্তা তৈরির একটি প্রাথমিক পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে এই পরিকল্পনা ও রাস্তা তৈরির ম্যাপের কী হলো সেটা তিনি জানেন না। তিনি বলেন, এলজিইডি যেভাবে সারাদেশে রাস্তা তৈরি করছে এতে একটু ভালো প্ল্যানিং হলেই বিওপি থেকে বিওপি পর্যন্ত রাস্তার যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়ে যাবে। এতে খরচও তেমন লাগবে না। দরকার শুধু পরিকল্পিত প্ল্যানিং করা। গ্রামেগঞ্জে এলজিইডির রাস্তার পরিকল্পনা বিডিআরের বিওপিগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

www.pathagar.com

ভারতের পানি আগ্রাসন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আ ল ম ফজলুর রহমান বলেন, টিপাইমুখ নিয়ে ভারত নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে একটি টিম ভারতে গেলেও টিপাইমুখে যেতে পারেনি। বলা হচ্ছে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেখানে হেলিকপ্টার নামতে পারেনি। হেলিকপ্টার সেখানে না নামতে পারলেও পাঁচ কিলোমিটার দূরে নামল না কেন। পাঁচ কিলোমিটার দূরে নেমে সেখান থেকে গাড়িতে বা পায়ে হেঁটেও যাওয়া যেতো। অথচ তা না করেই দেশে এসে আবদুর রাজ্জাক বলে দিয়েছেন টিপাইমুখে বাঁধ হলে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হবে না। এটা জনগণের সঙ্গে তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি বলেন, এসব কিছুই আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়। এসব বিষয়কে খাটো করে দেখার কোনো উপায় নেই।

রামগড় লুকাল ব্যাটালিয়ান থেকে বিডিআর

বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র আধা-সামরিক বাহিনীর নাম 'বিডিআর' (বাংলাদেশ রাইফেলস)। সুঃসাহস, উদ্যম মনোবল, আত্মত্যাগ ঐতিহ্য ও দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত, অতন্দ্র প্রহরী। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব-আর্থিক স্বার্থ, এমনকি আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার এবং শত্রু দেশের বিবিধ উস্কানী-আক্রমণ মোকাবেলায় প্রথম প্রতিরোধ বাহিনী বিডিআর। এই বাহিনীর রয়েছে দীর্ঘ গৌরবময় অতীত। দুইশত বছরের বেশী সময়ের আত্মত্যাগ এবং বীরগাঁথা গৌরবময় ইতিহাসের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী তারা।
বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনের ৩ মার্চ বিডিআর নামে যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করলো এর মূল যাত্রা শুরু হয় ১৭৯৫ সনে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে এর প্রথম সূচনা ঘটায়। সঙ্গত কারণেই সময়ের প্রয়োজনে, সর্বোপরি মানচিত্র, দেশ, শাসন পরিবর্তনের সঙ্গে নামে এবং পোশাকে পরিবর্তন আসে।

দ্র ফ্রন্টিয়্যার প্রোটেকশন ফোর্স/রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন (১৭৯৫-১৮৬০)

আজকের বিডিআর এর একেবারের আদি নাম 'ফ্রন্টিয়ার প্রোটেকশন ফোর্স'। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইহা গঠন করে। অচিরেই এর নাম পরিবর্তন করে ১৭৯৫ সনে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ান নামে শুরু। ঐ সময়ে রামগড় অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনের দায়িত্ব এই বাহিনীকে দেয়া হয়।

ফ্রন্টিয়্যার গার্ডস (১৮৬১-১৮৯০)

১৮৯১ সনে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন পুনগর্ঠিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ফ্রন্টিয়্যার গার্ডস তথা বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশ নামে যাত্রা শুরু করে। একজন উধবর্তন ওয়ারেন্ট অফিসার এর প্রধান ছিরেন। এর চারটি কোম্পানির মধ্যে তিনটি যথাক্রমে ঢাকা, কুমিল্লা, ও গ্যাঙ্গটক (সিকিমের রাজধানী) তে অবস্থান করত। ১৭৯৯ সনে এই বাহিনীর একটি ক্যাম্প ঢাকার পিলখানার সবুজ চত্বরে স্থাপিত হয়। এর নাম দেয়া হয় 'স্পেশাল রিজার্ভ কমপেক্'।

www.pathagar.com

বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশ (১৮৯২-১৯১৯)

১৮৯১ সনে ফ্রন্টিয়ার গার্ডসকে আবার পুনর্গঠিত করে নতুন নাম বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশ দেয়া হয়।

ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়্যার রাইফেলস (১৯২০-৪৬)

বেঙ্গল মিলিটারী পুলিশকে আরো শক্তিশালী কর্মক্ষম করার উদ্দেশ্যে ১৯২০ সনে এর নতুন নাম দেয়া হয় 'ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়্যার রাইফেলস'। এর প্রধান দায়িত্ব ছিল সীমান্ত পাহারা দেয়া।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-ইপিআর (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সনে উপমহাদেশ বিভক্তির পর সময়ের প্রয়োজনে ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়্যার রাইফেলসকে নব পর্যায়ে পুনর্গঠন করে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) নামে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়। কলিকাতা আর্মড পুলিশের কিছু সদস্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত ১০০০ সেনা সদস্যকে 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' (ইপিআর) এর সাথে একীভূত করা হয়। সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে এ বাহিনীতে পাঠানো হয়। এর প্রধান দায়িত্ব ছিল সীমান্ত প্রতিরক্ষা এবং চোরাচালানী প্রতিরোধ। ১৯৭১ সনে ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়াকালীন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩,৪৪৫। এদের অধিকাংশই স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়।

বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর ১৯৭২-)

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ১৯৭২ সনের ৩ মার্চ সাবেক 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' (ইপিআর) সদস্যদের নিয়ে 'বাংলাদেশ রাইফেলস' এর যাত্রা শুরু হয়। ২০০২ সনে একবার এর পোশাক পরিবর্তন হলেও ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারী ঘটনার পর ২০০৯ সনে বর্তমান পোশাক প্রবর্তিত হয়।

বিডিআর-এর পূর্বসূরীরা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেয়। সাহসী ভূমিকার জন্য 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস' এর মেজর তোফায়েলকে সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'নিশান-ই-হায়দার' এ ভূষিত করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে সূচনালগ্নেই 'ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস'এর সদস্যরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকার জন্য ১৪২ জন সদস্যকে সম্মানজনক উপাদিতে ভূষিত করা হয়। ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ ও মুন্সি আবদুর রউফকে সর্বোচ্চ খেতাব বীরশ্রেষ্ট, আটজনকে বীর উত্তম, ৪০ জনকে বীর বিক্রম এবং ৯১ জনকে বীর প্রতীক উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বাংলাদেশ রাইফেলস এর সদর দফতর ঢাকা মহানগরীর পিলখানায়। এর ১১টি 'সেক্টর' হেডকোয়ার্টার যথাক্রমে খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামে অবস্থিত। ২০০৯ সনের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারীতে বিডিআর' এর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ হাজার।

www.pathagar.com

২০০০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সীমান্তে বিএসএফ-এর আক্রমণে নিহত বাংলাদেশিদের পরিসংখ্যান। এছাড়া বিএসএফ-এর আরোকিছু অপরাধের পরিসংখ্যান রয়েছে চিত্রে।

1 January 2000-31 december 2009

Years (s)	Killed	1 M j u red	Arrested	Abducted	Missing	Rape	Snatching/Lootin 2	Push in	Other	Grand Total
2009	9S	77		25	92	1	1	11	3	308
2008	62	47	0	81	0	0	3	20		213
2007	120	82	8	98	9	3	5	198		523
2006	146	144	21	165	32	2	9	0		519
2005	104	66	26	78	14	3	4	0		295
2004	76	35	9	73	0	0	5	0		198
2003	43	82	21	120	7	2	8	0		283
2002	105	54	110	118	30* (incl 8 children)	0	12	0		429
2001	94	244	60	45	0	1	10	0		454
2000	39	38	11	106	0	2	13	0		209
Grand Total	887	869	266	909	184	14	70	229	3	3431

Note: From 2000-2009 In India-Bangladesh border area 887 persons were killed by BSF.

সূত্রঃ অধিকার

www.pathagar.com

Dispute Relaed to construction of Barbed wire fence by India within 150 yards of Zero Line

There were 63 incidents alone in 2004-05 regarding construction of Barbed wire Fince by India within 150 yards of Zero Line.

SI no.	BDR Sector / Bn/BOP	BSF Sector / Bn/BOP	Place of dispute (Pillar No)	Ditance from Zero Line
1	Khulna Sector	Kolkata Sector	4/1-RPto4/6-RP	100-120 yards
2	Rangpur Sector	Shilliguri Sector	881/9-S	100 yards
3	"	"	881/9-Sto881/11-S	150 yards
4	"	"	881/11-S	120 yards
5			892/1-S	150 yards
6	Comilla Sector	Teliamura Sector	1983/4-S	144 yards
7	Teliapara BOP	Shimna Camp	1983/5-S	144 yards
8	Harinkhola BOP	Shidhai Camp	1992/1-S,2-S&3-5	150 yards
9	Barojala BOP	Bejoynagar Camp	1 992/1 -S,2-S&3-S	150 yards
10	Dharmagarh BOP	Mohanpur Camp	1993/38-S	150 yards
11	"	"	1994MPtol994/2-S	150 yards
12	"	Harinakhola Camp	1996/33-Stol997/10-S	150 yards
13	Laxmipur BOP	KalkaliaCamp	2005/1 6-S	150 yards
14	Bisnopur BOP	Tufania Camp	2011/2-S	150 yards
15	"	Bhagalpur Camp	2014/4-Sto2015/1-S	150 yards
16	Singarbil BOP	"	2018/2-S	130 yards
17	"	"	2018/4-S to 2018/5-S	120 yards
18	"	"	2019/8-S to 2019/9-S	30-35 yards
19	"	Narayanpur Camp	20 18/6-S to 2018/5-S	120 yards
20	Azampur BOP	"	2019MPto2019/6-S	150 yards
21	"	"	2019/7-S to 2019/9-S	30-35 yards
22	"	"	2020 MP	150 yards
23	Azampur BOP	Narayanpur Camp	BP 202 IMP	133 yards
24	Fakirmora BOP	Lankamora Camp	BP 2021/8-S to 2022 MP	133 yards
25	"	"	BP2022/5-S	150 yards
26	"	Agartalal CP	BP 2022/1 0-S	150 yards
27	Akhaura ICP	"	BP 2023/4-S to 2023 6-S	150 yards
28	"	"	BP2024MP	150 yards
29	"	Joynagar Camp	BP2024/4-S	150 yards
30	Coloinel Bazar BOP	"	BP2024/9-S	150 yards
31	Chandidar BOP	Pathoriadar Camp	BP23033/2-S	140 yards
32	"	"	BP2034MP	135 yards
33	Sankuchail BOP	Kolamchara BSF camp	BP2046/6-S	135 yards
34	Saldanadi BOP	Ashabari Camp	BP 2052/44-S to 2052/45-S	120 yards
35	"	Putia Camp	BP 2052/44-S	70-80 yards
36	Nayanpur BOP	Ashabari Camp	BP2059/8-S	130 yards
37	Sankuchail BOP	Kokamchara BSF camp	BP 2062/11-S	135 yards
38	Kharera BOP	Kamalchara Camp	BP 2065-8-S to 2066 MP	125 yards
39	Karojala BOP	Kulubari Camp	BP 2079/3-S to 2079/4-S	120 yards
40	Shiberbazar BOP	Nirvoypur Camp	BP 2096/11-S	120 yards
41	Shiberbazar	Nirvorpur BSF camp	BP 2896/11-S	120 yards
42	Sylhet Sector	Teliamura Sector	BP 1847/5-Sto6-S	120 yards

www.pathagar.com

43	Alinagar BOP	Ranguti camp	BP 1847/38-S - 1848/2-S	80-100 yards
44	Chatlapur BOP	Tilabazar Camp	BP 1855/29-S to 1856/22-S	70-120 yards
45	"	"	BP 1856 MP to 1856/1-R	25 - 70 yards
46	"	"	BP 1856/2-RB to 1856/22-S	30 - 70 yards
47	Sharifpur BOP	"	BP 1858/1 0-S to 1859/1 1-S	50 -90 yards
48	"	"	BP 1 859 MP to 1859/10-S	70 -75 yards
49	"	Shamruchara Camp	BP 1860/4-S to 1860 6-S	40 - 60 yard
50	"	"	BP 1861 MPto 1863 19-S	20-150 yards
51	Sharifpur& Debalchara BOP	Tilabazar & Mukti-chara BSF camp	BP 1856, 1862 & 1876	Within 1 50 yards
52	Kurma BOP	37 BSF BN Muraichara camp	BP 1903/6 1-S to 1904 MP	135 - 146 yards
53	"	"	BP 1906 MP to 1906/7-S	20-145 yards
54	Dholoi BOP	Dholoi BSF camp	BP 1910 to 1911	100/120 yards
55	Doloi BOP	Baligaon camp	BP1910/46-S	142 yards
56	Roma BOP	Baghaibari camp	1958 MP to 1958/70-S	30-70 yards
57	"	"	1959/44-S to 1959/56-S	80-150 yards
58	Balla BOP	37 BSF BN. Shingichara camp	1963/30-Stol963/35-S	
59	"	"	1963/30-S to 1963/35-S	140 yards
60	"	"	1964 MPto 1 964/1 5-S	50 -140 yards
	Khagrachari Sectoir	Gokulnagar Sector		
61	Kashipur BOP	Kathalchari camp	2216-6-RB	Within 150 yards
62	"	"	2217 3-Rl. 2217/4-Rl, 22173-S&2217/8-RB	within 150 yards
	Sadiabari CIO camp	Gaigora BSF camp	BP 2222/4-RB	within 150 yards
63	Chalitachara CIO camp	Bandarkhun BSF camp	BP 2225/2-RB	within 150 yards

সূত্রঃ ডিফেন্স জার্নাল সেপ্টেম্বর-২০০৮

www.pathagar.com

Serial No.	Name	Office	Factory	No. of Qutlet
1.	Md. A R Abduli	1, Chandni chaw Street, Kolkata-700072	47, South Tangra Road, Kolkata	08
2.	Nihal Ahmed	V/200/1, Karbala Road, Kokata-700018	5, Piter lane, Kolkata-700073	17
3.	A Mohammad	5/2H/23, Vuraiash Road, Kokata-700023	_	14
4.	Arif Mohammad	85w, Tapashia Road, Kolkata-700039	_	06
5.	Lin Keu Chew	35 Chatawala goli, Kolkata-700012	_	15
6.	Mohammad Abbas	4/3,Kazi Basti, 2nd lane, Kolkata-700011	62u, Tiljala Road, Kolkata-700073	08
7.	Shukumar Manna	66/1, Tiljala Road, Kolkata-700046	_	07
8.	Moksud Mohammad	12, Kalfala lane, Kolkata-700073	51, Iqbalpur Road, Kolkata-700023	25
9.	Ram Gopal Mridha	43, Dapshan Road, Hawra	_	27
10.	Vobesh Mallik	38, DV Road, Konsaspara, Uttor Chabbish Pargana	_	44
11.	Ideal Tanary	_	33/1, Uttar Tapshia Road, Kolkata-700043	05
12.	Izaz Mohammad	2, P M Basti, 2nd bi lane, Hawra	_	14
13.	Forhad Abedin	60 Tapshia Road (s), Kolkata-700039	_	12
14.	Tarapodo Acharia	252 A, Picnic Garden Road, Kolkata-700039	_	30
15.	Osman	77, Lee Road, Kolkata-700019	Mahta Building, Kolkata-700001	05

www.pathagar.com

16.	Mahbub	13/C. Logr Chitpur Road, Kolkata-700001	1st&3rd floor, Mahta Building, Kolkata-700001	20
17.	Talowar (Netive Panjabi)	88A, Modonmohon Barman Street, Kolkata-700007	_	10
18.	Langra Jomir	72, Modonmohon Barman Street, Kolkata-700007	_	06
19.	Chen Khoi Koi	Tangri, P-1&2, Ishwar Mondol lane, Kolkata-700046 Ph: 23296290 (of.) 23291710 (Res)		20
20.	Aditwa mittal	Rajarhat, Kolkata	Poddar cot (Near of Raymond showroom) Ph: 22258151, 22253091	11
21	Dipangkar Bangali	Argent Press, Kashipur, Kolkata-700002. Ph. 22351975, 08630253	Dep Electronice, 9, Polok street, Kolkata-700001	shop

www.pathagar.com

চুক্তির আবর্তে 'তিনবিঘা কডিডোর'
এবং দহগ্রাম ছিটমহলবাসীর পাওয়া না পাওয়ার কিছু কথা :

চতুর্দিকে ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়া, কর্তৃপক্ষের বৈরি অবস্থান সুলভ আচরণ এবং প্রতিটি মিনিটে কোণঠাসা করে রাখা সর্বাত্মক চেষ্টা বাংলাদেশের যে ভূ-খণ্ডকে ঘিরে তা হলো 'দাহগ্রাম আঙ্গর পোতা।'

বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার অন্তর্গত পাটগ্রাম উপজেলার পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ কোণায় অবস্থিত বৃহত্তর ছিটমহল দহগ্রাম আঙ্গর পোতা। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কুচবিহার জেলার অন্তর্গত এ ছিটমহলটি। ভারতের অভ্যন্তরে এ ছিটমহলটি অবস্থিত ও বাংলাদেশের মূল-ভূখণ্ডের সাথে সড়ক পথে কোনো যাতায়াতের উপায় না থাকায় বাংলাদেশিদের চলাচলের জন্য এ পর্যন্ত ৪টি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। বহুল আলোচিত এক খণ্ড ভারতীয় জমির ওপর দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে বাংলাদেশি জনসাধারণকে বিভিন্ন সময়ে পড়তে হয়েছে নানামুখী জটিল ও কঠিন সমস্যায়। (১৭৮ × ৮৫) মিটার আয়তনের জমির খণ্ডটুকুই আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে হাজারো নাগরিকের স্বাধীন সার্বভৌম নাগরিক অধিকার।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে নেহেরু-নুন চুক্তি, ১৯৭৪ সালের ৭ অক্টোবর পররাষ্ট্র-সচিব পর্যায়ে চুক্তি এবং ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ভারতের বিদেশ সচিব ও বাংলাদেশের অতিরিক্ত বিদেশ সচিব স্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পাদন হয়।

চার চারটি চুক্তির এ কটি চুক্তিও যদি সফলভাবে বাস্তবায়িত হতো তাহলে অনেক আগেই বাংলাদেশিদের বন্দি জীবনের অবসান হতো। তাহলে দহগ্রামবাসীকে কি বন্ধিত্বের মানষিক যন্ত্রণা নিয়েই মরতে হবে? পাঠকোত্তর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের জানা উচিত সম্পাদিত চুক্তিগুলোর বিষয় বস্তু কী ছিল? কতটুকুই বা বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৯৫৮ সালের নেহেরু নুন চুক্তির তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের এ দুই ঐতিহাসিক নেতার মধ্যে সমঝোতা চুক্তির সবিস্তারে কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও জানা গেছে দহগ্রাম আঙ্গরপোতা ছিট মহলবাসীর নির্বিঘ্নে যাতায়াতের বিষয়টিই মূখ্য ছিল। সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে একের এক মতের অমিল, উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে সম্প্রতি চুক্তির ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

নেহেরু-নুন চুক্তির ৩ বছর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

১৯৭৪ সালের মুজিব ইন্দিরা চুক্তি :

১৯৭৪ সালের যে মাসে মুজিব-ইন্দিরা একটি সব সীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্ত মোতাবেক ১২ নং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ছিট মহল ভারতের নিকট হস্তান্তর করার বিনিময়ে বাংলাদেশের দহগ্রাম আঙ্গরপোতা ছিট মহলের অধিবাসীদেকে ভারত সরকার মূল ভূ-খণ্ডের সাথে নির্বিঘ্নে যাতায়াত ও চলাচলের

www.pathagar.com

জন্য 'তিনবিঘা কড়িডোর' নামক ভূ-খণ্ডটি চিরস্থায়ী লিজ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

এ সম্পর্কে ভারতীয় এক বুলেটিনে প্রকাশ ওই চুক্তির ১-১৪ নম্বর শর্তটি নিম্নরূপ:

"১২ নং দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশ এবং তৎসংলগ্ন ছিট মহল যার অনুমানিক আয়তন ২.৬৪ বর্গমাইল ভারতে থাকবে এবং বিনিময়ে দহগ্রাম আঙ্গর পোতা ছিটমহল বাংলাদেশের থাকবে। বাংলাদেশের পানবাড়ী গ্রামের (থানা-পাটগ্রাম) দখলে দহগ্রামকে সংযুক্ত করার জন্য ভারত তিনবিঘা কড়িডোর সন্নিকটে (১৭৮ × ৮৫) মিটার এলাকা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী লিজ দিবে।"

চুক্তি মোতাবেক ভারত সরকার ১২ নং দক্ষিণ বেরুবাড়ী এবং সংলগ্ন এলাকা ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে অধি গ্রহণ করে। অপরদিকে ভারত সরকার সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন ঘটাতে কালক্ষেপণ করতে থাকে। অসম্পাদিত এ চুক্তির বিপক্ষে ভারতীয় দুটি উগ্র সংগঠনেরও জন্ম হয়। একটি হলো কুচলীবাড়ী সংগ্রাম সমিতি এবং অপরটি হলো তিনবিঘা সংগ্রাম সমিতি। রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এ সংগঠন দুটি বিভিন্ন সময়ে দহগ্রাম অঙ্গরপোতাবাসীর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাত।

ভারতীয় কতৃপক্ষের উদাসীন মনোভাব, সম্পাদিত চুক্তিবিরোধী উগ্রসংগঠনের আন্দোলন, ভারতীয় হাইকোর্টে চুক্তির বিরুদ্ধে মামলা, মুজিব সরকারের পরিবর্তনসহ বাংলাদেশ সরকারের জোড়ালো মনোভাবের অভাবে-দীর্ঘদিন থেকে বঞ্চিত থাকে দহগ্রামবাসী। এ সময়গুলোতে দহগ্রাম ছিটমহলের হাজরো সম্ভাবনাময় মুখ হারিয়ে যেতে থাকে অমানিশার ঘোর অন্ধকারে। ১৯৮২ সালে সামসুদ্দোহা নরসিংহ রাও চুক্তি :

১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর দীর্ঘ ৮ বছর পর দহগ্রাম আঙ্গর পোতা যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম 'তিনবিঘা কড়িডোর' নিয়ে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। সে সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামসুদ্দোহা ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী নরসিংরাও এক সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষরের পর তিনবিঘা কড়িডোর সম্পর্কে চিরস্থায়ী লীজের শর্তাবলী নির্ধারণ ও হস্তান্তর করা হয়।

তিনবিঘা চিরস্থায়ী লীজের শর্তাবলী নিম্নরূপ :

তিনবিঘা চিরস্থায়ী লীজের শর্তাবলী নতুন দিল্লী

মহামান্য ৭ অক্টোবর ১৯৮২

আমি সম্মানের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার স্থল সীমানা চিহ্নিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯৭৫ সালের ১৬ মে নতুন দিল্লীতে স্বাক্ষরিত চুক্তির ১ নং অনুচ্ছেদের ১৪ নং দফার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক উল্লেখ করছি যে, বাংলাদেশের পানবাড়ী মৌজার (থানা-পাটগ্রাম)

www.pathagar.com

সঙ্গে দহগ্রামের সংযোগ সাধনের জন্য তিনবিঘার সন্নিকটে (১৭৮ × ৮৫) মিটার এলাকা ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে চিরস্থায়ী লীজ প্রদান সম্পর্কে আমাদের দুই সরকারের মধ্যে নিম্নলিখিত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১। দহগ্রাম এবং আঙ্গরপোতাকে পানবাড়ী মৌজার (থানা-পাটগ্রাম) সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্যই পূর্বোক্ত এলাকা চিরস্থায়ী ভাবে লীজ দেয়া হবে যাতে বাংলাদেশ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার ওপর সার্বভৌম ব্যবহার করতে পারে।

২। লীজ দেয়া এলাকায় ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। লীজ প্রদত্ত এলাকার বার্ষিক খাজনা হবে বাংলাদেশি একটাকা মাত্র। যাই হোক বাংলাদেশকে এই খাজনা দিতে হবে না এবং ভারত সরকার এই খাজনা দাবি করার অধিকার পরিত্যাগ করেছে।

৩। উপরোক্ত ১ নং পরিচ্ছেদে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চিরস্থায়ী লীজ এলাকায় নিরুপদ্রব অধিকার এবং ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

৪। পুলিশ আধা-সামরিক ও সামরিক বাহিনীর লোকজন তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ, সাজসরঞ্জাম ও সরবরাহসহ লীজভুক্ত এলাকায় স্বাধীন ও বাধাহীন চলাচলের অধিকার পাবে এবং এজন্য তাদের কোনো পাসপোর্ট বা ভ্রমণ দলিল বহন করতে হবে না। লীজ দেয়া এলাকা দিয়ে বাংলাদেশি মালপত্র যুক্তভাবে চলাচল করতে পারবে। কাস্টমস ডিউটি, ট্যাক্স বা অন্য কোনো প্রকার লেভী বা ট্রানজিট চার্জ দেওয়ার ও প্রয়োজন হবে না।

৫। ভারতীয় নাগরিক, পুলিশ, আধা-সামরিক ও সামরিক বাহিনীর লোকজন তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, সাজসরঞ্জাম এবং সরবরাহ লীজ এলাকায় উভয়দিকে স্বাধীন এবং বাধাহীন চলাচলের অধিকার পাবে। লীজ দেয়া এলাকা দিয়ে ভারতীয় মালপত্র মুক্তভাবে চলাচল করতে পারবে। এই ধরনের যাতায়াতের জন্য কড়িডোরের মাঝখান দিয়ে বর্তমানে যে রাস্তা গেছে তাই ব্যবহার করা হবে। প্রয়োজনবোধে ভারত লীজ প্রদত্ত এলাকার অথবা মাটির তলা দিয়ে শুধুমাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য এমনভাবে রাস্তা নির্মাণ করতে পারবে যাতে ১ নং এবং ৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাংলাদেশের নাগরিক ও মালামাল চলাচলে কোনো প্রকারের বাধাগ্রস্থ না হয়।

৬। লীজ প্রদত্ত এলাকার চতুর্দিকে স্থায়ী চিহ্ন স্থাপন এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে বেড়া দেওয়ার ব্যাপারে দুই সরকার সহযোগিতা করবে।

৭। ৪নং এবং ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো দেশের নাগরিকদের বা মালপত্র চলাচলে কোনোরূপ বাধার সৃষ্টি না করে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েই লীজ দেয়া এলাকার ওপর দিয়ে অথবা মাটির নীচ দিয়ে কেবল ইলেকট্রিক লাইন, জল এবং নর্দশার জন্য নিষ্কাশন পাইপ বসাতে পারবে।

৮। রংপুরের (বাংলাদেশ) এবং কুচবিহারের (ভারত) ডেপুটি কমিশনারদের লীজের শর্তাবলী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হবে। কোনো বিষয়ে মতানৈক্য হলে তারা তাদের নিজ নিজ সরকারকে সে বিষয়ের নিস্পত্তির জন্য জানাবে। না কোনো বাংলাদেশি/ ভারতীয় নাগরিক লীজ দেয়া এলাকায় কোনো অপরাধমূলক

www.pathagar.com

ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বদেশের আইন প্রয়োগকারী এজেন্সী সে দেশের জাতীয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। লীজ দেয়া এলাকার কোনো ঘটনায় উভয় দেশের নাগরিক জড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উপস্থিত আইন প্রয়োগকারী এজেন্সী আইন শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে; সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশের আইন প্রয়োগকারী এজেন্সীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়া হবে। এইসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী এজেন্সী কর্তৃক ধৃত কোনো ভারতীয় নাগরিককে তৎক্ষণাৎ ভারতীয় পক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে এবং অনুরুপভাবে ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী এজন্সী কর্তৃক ধৃত কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশি পক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে। লীজ দেয়া এলাকার অবশিষ্ট এক্তিয়ার ভারতের হাতে থাকবে।

আমাদের দুই সরকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সমঝোতা সঠিকভাবে উপরে বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে আপনার নিশ্চয়তা পেলে কৃতজ্ঞ হবো। আমি সমমানের সঙ্গে আরো প্রস্তাব দিচ্ছি যে এই পত্র এবং সমঝোতা অনুমোদন করে আমাদের দুই সরকারের মধ্যে লীজ প্রদত্ত এলাকা সম্পর্কে একটা চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং তা ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থান সীমানা চিহ্নিত কারণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে চুক্তি হয়েছিল তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে।

মহামান্য আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার নিশ্চিত আশ্বাস গ্রহণ করুন।

পি. ভি নরসিংহ রাও
বিদেশ মন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার

তিনবিঘা লীজের শর্তবিরোধী মামলা

উল্লিখিত উগ্র সংগঠন কুচলীবাড়ী সংগ্রাম সমিতি ও তিনবিঘা সংগ্রাম সমিতি কর্তৃক তিনবিঘা চিরস্থায়ী লীজের-বিরুদ্ধে ১৯৮৪ সালের ১২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগে এটি আপীল করে। ১৯৮৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞা আদালত লীজের পক্ষে রায় ঘোষণা করলে- উক্ত সংগঠনের পক্ষথেকে আবারও রায়ের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। দীর্ঘ শুনানীর পর মহামান্য আদালত আগের রায়ই বহাল রাখেন। এরপর ও সংগঠন দুটির অপতৎপরতা থেমে থাকেনি। সর্বশেষ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি অধিকরণ আইনের আওতায় চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনবিঘা কড়িডোর ভূ-খণ্ডটি অধিকরণের বিরোধীতা করেন ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে পৃথক আরও একশটি মামলাদায়ের করে। কিন্তু মহামান্য আদালত মামলাটি নাকচ করে দেয় এবং তিনবিঘা স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। দীর্ঘ আইনি জটিলতার অবসান কল্পে ভারত সরকার ১৯৮২-র চুক্তিবদ্ধ শর্তগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ঢাকা-দিল্লী সচিব পর্যায়ে ১৯৮২ সালের তিনবিঘা লীজের চিরস্থায়ী শর্তাবলী নবায়নের লক্ষ্যে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা

www.pathagar.com

জিয়া উদ্ভোধন করেন বহু প্রতিক্ষিত দহগ্রাম তিনবিঘা কড়িডোরের ওপর দিয়ে সীমিত আকারে চলাচলের দ্বার। ফলে সীমিত আকারে চলাচলের সুযোগ অর্জন করে দহ গ্রামবাসী। ২৬শে মার্চ ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তিতে ভারত সরকার অতি কৌশলে ১৯৭৪ ও ১৯৮২ সালের চুক্তিকে পাশ কাটিয়ে একটি শর্তআরোপ করে। ৭ নম্বর এ শর্তটিই কাল হয়ে দাড়িয়েছে দহ গ্রামের প্রায় ২০ হাজার অধিবাসীর ভাগ্যে। ২৪ ঘন্টা নির্ভিঘ্নে চলাচলের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে এ অনুচ্ছেটি। পূর্বে উল্লেখিত চুক্তির শর্ত সমূহে যাতায়াতের কোনো প্রকার সময়ের উল্লেখ ছিল না কিন্তু পরবর্তী সময়ের সমঝোতা চুক্তির ৭ নম্বর চুক্তিতে সময়ের কথা উল্লেখ থাকায় বেশ বিপাকে পড়তে হচ্ছে দহগ্রাম অঙ্গুর পোতার অধিবাসী ও সরকারকে।

মাহমুদ আলী-জে. এন দীক্ষিত সমঝোতা চুক্তি ঃ
এ এইচ মাহমুদ আলী অতিরিক্ত বিদেশ সচিব পররাষ্ট্র দফতর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা
নতুন দিল্লী
২৬ শে মার্চ ১৯৯২।
মহামান্য
আমি সম্মানের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার স্থল সীমানা চিহ্নিত করণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে স্বাক্ষরিত চুক্তির ১ নং অনুচ্ছেদের ১৪ নং দফা, ১৯৮২ সলের ৭ অক্টোবর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ও ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর মধ্যে তিনবিঘা এলাকা চিরস্থায়ী লীজের শর্তাবলী সম্পর্কে বিনিময়কৃত পত্রাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বাংলাদেশকে তিনবিঘা এলাকা লীজ দেয়ার পদ্ধতি সম্বলিত আপনার ২৬ মার্চ ১৯৯২ তারিখের পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করছি। আমি সম্মানের সঙ্গে নিশ্চয় করে বলছি যে, তিনবিঘা এলাকা লীজ দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আমদের দুই সরকারের মধ্যে স্থাপিত সমঝোতা নিম্নে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে :
১। তিনবিঘা এলাকার ওপর ভারতের সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনবিঘা কড়িডারের চারকোণে ভারতীয় পতাকা উড়বে।
২। ২৬ জুন ১৯৯২-র পূর্বে ভারত দহগ্রামকে (বাংলাদেশ) পাটগ্রামের (বাংলাদেশ) সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য বর্তমান উত্তর দক্ষিণ সড়কের মোটামুটি সমকোণে একটি পূর্ব পশ্চিম সড়ক নির্মাণ করবে। নতুন পূর্ব-পশ্চিম সড়ক প্রস্থ ও গুণগতভাবে বর্তমানের উত্তর-দক্ষিণ সড়কের অনুরূপ হবে।
৩। ভারত প্রস্তাবিত সড়কের উভয় পার্শ্বে বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত ভূমি সৌন্দর্য বর্ধন কর্ম (উদ্যান) সম্পন্ন এবং রক্ষণা বেক্ষণ করবে যাতে জবরদখল এবং অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়। ভবিষ্যতে নর্দমা ক্যাবল স্থাপন জল সরবরাহ প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হবে।

www.pathagar.com

৪। পূর্ব-পশ্চিম সড়কের উভয় প্রান্ত যেখানে বাংলাদেশ-সীমানা স্পর্শ করেছে সেখানে দুটি করে চেক পয়েন্ট স্থাপন করা হবে। ঐগুলো বাংলাদেশ এবং ভারতীয় কতৃপক্ষ দ্বারা আলাদাভাবে পরিচালিত হবে যাতে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫। কড়িডোরে চলাচল নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে এবং সেই অনুযায়ী পূর্ব-পশ্চিম সড়কে চেক পয়েন্টগুলো খোলা এবং বন্ধ করা এমনভাবে সমন্বয় করা হবে যাতে বাংলাদেশি এবং ভারতীয় যানবাহন বা লোকজন মিশতে না পারে।

৬। সংযোগস্থলে অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ব-পশ্চিম সড়ক উত্তর-দক্ষিণ সড়ককে ছেদ (ক্রস) করবে সেখানে চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ভারতীয় ট্রাফিক পুলিশ কন্টোল থাকবে।

৭। উত্তর-দক্ষিণ সড়কে ভারতীয় চলাচল বহাল থাকবে। বাংলাদেশ ট্রাফিক দিনের বেলায় একঘন্টা অন্তর একঘন্টা করে পূর্ব-পশ্চিম সড়ক ব্যবহার করবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেসামরিক প্রশাসকদের চলাচল এবং চিকিৎসা সম্পর্কিত জরুরি অবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে উপরোক্ত ব্যবহার ব্যতিক্রম করা হবে।

৮। উভয়দিকে নিরপত্তা সংস্থাগুলির নজরদারির সুবিধার্থে সমস্ত কড়িডোরে এলাকায় প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

৯। লীজের শর্তাবলী বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো মত পার্থক্য দেখা দিলে তা প্রাথমিকভাবে লালমনিরহাটের (বাংলাদেশ) ডেপুটি কমিশনার এবং কুচবিহারের (ভারত) ডেপুটি কমিশনারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্যে নিস্পত্তি করা হবে। যদি কোনো মতানৈক্য অবশিষ্ট থাকে তা নিস্পত্তির জন্য তাঁদের নিজ নিজ সরকারকে জানাবেন।

১০। লীজ দেয়া এলাকায় সংঘটিত অপরাধমূলক ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়ের, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারত পরস্পরকে প্রয়োজনীয় বিচার বিষয়ক সহায়তা দেবে।

১১। (২৬ জুন ১৯৯২ থেকে ব্যবস্থাবলী বলবৎ হবে)

মহামান্য আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার নিশ্চিত আশ্বাস গ্রহণ করুন।

এ. এইচ মাহমুদ আলী
অতিরিক্ত বিদেশ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহামান্য
শ্রী জে. এন দীক্ষিত
বিদেশ সচিব
বিদেশ মন্ত্রণালয়
প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার
নতুনদিল্লী।

www.pathagar.com

সর্বশেষ পর্যালোচনা :

১৯৭৪ সালের ইন্দিরা, মুজিব চুক্তির পর ভারত সরকার বিশাল বেরুবাড়ী ১মাস পরই গ্রহণ করে বেরুবাড়ী হস্তান্তরের পর নিয়ম অনুযায়ী তিন বিঘা করিডোর লীজের বাস্তবায়নও সে সময় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভারত সরকার তিন বিঘা লীজের বাস্তবায়ন ঘটাতে কালক্ষেপণ করতে থাকে দীর্ঘ দিন। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের উচিত ছিল একদিকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর অন্য দিকে চুক্তির বাস্তবায়ন করা। প্রকৃত পক্ষে ভারতের সাথে বন্ধু সূলভ আচরণ তথা নমনীয় ভাবই পরবর্তীতে দহ গ্রাম, আঙ্গর পোতা, ছিট মহল বাসীর ২৪ ঘণ্টা অবাধ যাতায়াতের প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিচ্ছে এখনও।

বর্তমানে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের অবস্থা :

হতভাগা দহ গ্রাম আঙ্গর পোতাবাসী ১২ ঘণ্টা অন্তর ১২ ঘণ্টা চলাচলের সুযোগ পেলেও ১২ ঘণ্টা বন্দি থাকে তীব্র ভয় আর আতঙ্কের মধ্যে কড়িডোর সড়ক দিয়ে ১০ টির বেশি গরু, ছাগল বিক্রির উদ্দেশ্য বের করা সম্পূর্ণ নিষেধ, করিডোর সড়কটির উভয়দিকে বিভিন্ন গাছ পালা লাগিয়ে সরু করে ফেলেছে রাস্তাটিকে, ফলে কোনো ভ্যান গাড়ি গাছে স্পর্শ করলে তেড়ে এসে অপমান করে ভারতীয় দায়িত্বরত সদস্যরা, অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বাংলাদেশি নাগরিকদের গতি বিধি চলা ফেরার ওপর নজর দারি অব্যাহত রেখে কোণঠাশায় ফেলেছে সাধারণ জনসাধারণকে, ভারতীয়দের বাধার কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, তিস্তা নদী ভেঙ্গে চলেছে অনবরত অপর দিক দিকে দখল করে চলেছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, এখানকার চিকিৎসা সেবার মান অত্যন্ত শোচণীয়, খাদ্য-বস্ত্রের অভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে হাজারো নর নারীকে, কাগজে কলমে দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টিকে জাতীয় করণের উল্লেখ থাকলেও আজ পর্যন্ত জাতীয় করণ হয়নি। সর্বোপরি দহ গ্রাম আঙ্গর পোতাবাসীর একটাই আকূল আবেদন তারা যেন মূল ভূখণ্ডের সাথে ২৪ ঘণ্টা অবাধ যাতায়াতের সুযোগ পান।

-০-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অলিউল্লাহ নোমান। পুরোনাম আবু সাঈদ মুহাম্মদ (এ.এস.এম.) অলিউল্লাহ নোমান। জন্ম হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলাধীন নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ইটাখোলা গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বাবা ইটাখোলা সিনিয়র মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মরহুম মাওলানা সানাউল্লাহ। মাতা রহিমা বেগম। ৩ ভাই ২ বোনের মধ্যে সবার বড় তিনি। পারিবারিক জীবনে স্ত্রী ইয়াসমিন সুলতানা, ২ মেয়ে ফারহানা, ফাইজা ও ছোট ভাই নাঈমকে নিয়ে বসবাস করছেন ঢাকার খিলগাঁও এলাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এস. এস. অধ্যয়নরত অবস্থায় দৈনিক 'সবুজ বাংলা' পত্রিকা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। শিক্ষাজীবন শেষে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন সাংবাদিকতাকে। কাজ করেছেন মাসিক 'শিক্ষা বিচিত্রা' ও বার্তা সংস্থা 'নিউজ নেটওয়ার্ক'এ। টানা ৮ বছর স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে চাকরি করেন দৈনিক 'ইনকিলাব' পত্রিকায়। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আমার দেশ।' প্রকশনার শুরুতেই যোগদান করেন সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে। এর আগে 'বিচার ও রাজনীতি' নামে আরো একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। 'কাটা তারে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ' তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। কর্মজীবনে তিনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য লাভ করেন 'পিআইপি-ইউনিসেফ' পুরস্কার।

KATATARE ABARUDHA BANGLADESH

By : Oliullah Noman

Published by : Matri Vasha Prokash

11, P K Roy Road, Banglabazar,

Dhaka-1100. Cell : 01716315884

Design : Solyman Shohag

মাতৃভাষা প্রকাশ